দাম : সাত টাকা

স্বস্তিকা

৬৪ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা।। ৬ ফেব্রুয়ারি - ২০১২, ২২ মাঘ - ১৪১৮

শিক্ষার অধিকার

কেন্দ্রের সর্বনাশা শিক্ষা নীতি... পৃষ্ঠা - ১৫

শেয়ার মার্কেট নিয়ে অন্তর্তদন্ত — একটি সমীক্ষা..... পৃষ্ঠা - ১১

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ❑ ৬-৭

মণিপুরে ৮০ শতাংশ ভোট : কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ❑ ৮

পার্টি সম্মেলনগুলোতে সিপিএম নেতৃত্ব উলঙ্গ হয়ে গেছেন! ❑ ৯

শেয়ার মার্কেটে অনিশ্চয়তার কারণগুলি নিয়ে একটি অন্তর্তদন্ত ❑ এন. সি. দে ❑ ১১

উচ্চশিক্ষার নাগাল পাওয়া যাবে কীভাবে? ❑ এম ভি কামাথ ❑ ১৩

নানা ইস্যুতে সরব মমতা কেন্দ্রের সর্বনাশা শিক্ষানীতি নিয়ে নীরব কেন? ❑ সাধন কুমার পাল ❑ ১৫

তেষট্টি বছরে শিক্ষার হাল কোথায় পৌঁছেছে? ❑ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ ১৭

শিক্ষার অধিকার ❑ ১৯

খোলা চিঠি : লেখা-পড়া দামি, ভাতের গ্রাস আরও দামি ❑ সুন্দর মৌলিক ❑ ২১

শিব-গীতার কথা ❑ রবীন সেনগুপ্ত ❑ ২৪

চৈতন্যযুগের পরবর্তীকালে নতুন ধারার মন্দির; পর্ব-৬ ❑ প্রণব রায় ❑ ২৫

কনসার্ট ফর যূথিকা রায় : ৯০ বছর পূর্তিতে যূথিকা রায়ের সম্মাননা ❑ বিকাশ ভট্টাচার্য ❑ ২৭

আইন ঠেকাতে আইনসভা ভাঙ্গা অপরাধ নয় ❑ শিবাজী গুপ্ত ❑ ২৮

নিয়মিত বিভাগ

এইসময় : ১০ ❑ **অন্যরকম : ২০** ❑ **চিঠিপত্র : ২২** ❑ **ভাবনা-চিন্তা : ২৩** ❑ **অঙ্গনা : ২৬** ❑ **শব্দরূপ : ৩০** ❑ **চিত্রকথা : ৩১** ❑ **সমাবেশ-সমাচার : ৩২**

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

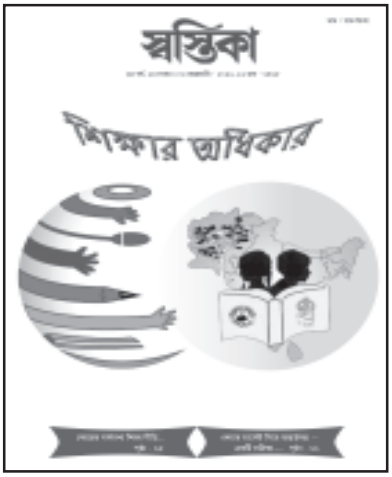

শিক্ষার অধিকার— পৃঃ ১৫-১৯

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ২৩ সংখ্যা, ২২ মাঘ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৩, ৬ ফেব্রুয়ারি - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail :
swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাদের সহৃদয় পাঠকদের জানাচ্ছি, গত কয়েক মাসে নিউজপ্রিন্টের দাম এবং কাগজ ছাপার আনুষঙ্গিক খরচ যেভাবে ক্রমশ বেড়ে চলেছে, তাতে বর্তমান মূল্যে স্বস্তিকা আপনাদের হাতে দেওয়া দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। এই অবস্থায় নিরুপায় হয়েই গত ২৩ জানুয়ারি (৬৪ বর্ষ, ২১ সংখ্যা) সংখ্যা থেকে সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকার দাম ৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭ টাকা এবং বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩২৫ টাকা করতে বাধ্য হয়েছি। পত্রিকার এই আর্থিক সংকটময় মুহূর্তে পাঠকবর্গের একান্ত সহযোগিতা আমাদের একমাত্র কাম্য। বিগত ৬৪ বছর ধরে আপনাদের সহৃদয় চিত্তের যে প্রেরণা স্বস্তিকা-কে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, তা থেকে আমরা বঞ্চিত হবো না— এই প্রত্যাশা রইল।

—স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

সম্পাদকীয়

শিল্পায়নের সম্ভাবনা

পশ্চিমবঙ্গে নতুন সরকারের আয়ু এখনও এক বৎসর অতিক্রান্ত হয় নাই। শোনা যাইতেছে, এর মধ্যেই নাকি বহু শিল্পপতির শিল্পপ্রস্তাব সরকারের নিকট জমা পড়িয়াছে। কিন্তু এই মুহূর্তে যে প্রশ্নটি আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত হইতেছে তাহা হইল এই রাজ্যে আদৌ কি শিল্পায়ন সম্ভব? শিল্পপতিদের শিল্প প্রস্তাব আদৌ কি কোনওদিন বাস্তবায়িত হইবে? এই রাজ্যে সরকারি নীতির ফলে এখন মূল বাধা জমি। শিল্প বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গির কারণে শিল্পপতিদের বর্তমানে অসংখ্য ক্ষুদ্র জমির মালিকদের সঙ্গে দর কষাকষি করিতে হইবে। আবার আকাশচুম্বী মূল্যের আশায় জমির মালিকরা যদি জমি আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকেন তাহা হইলে শিল্পে বিনিয়োগেরও খরচ বাড়িবে। সম্প্রতি কাটোয়ার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য চাষীদের নিকট হইতে জমি কিনিতে নামিয়া দালালদের উৎপাতের সম্মুখীন হইয়াছে এন টি পি সি। এন টি পি সি-ই প্রথম সংস্থা যাহারা রাজ্য সরকারের শর্ত মানিয়া সরাসরি প্রায় ৫০০ একর জমি কিনিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু প্রথমে বাদ সাধিয়াছে দালালদের এই দৌরাত্ম্য। অর্থাৎ শিল্পপতিদের আশঙ্কাই সত্য হইয়াছে। এই সমস্যা কতজন শিল্পপতি মানিয়া লইয়া শিল্প বিনিয়োগে আগ্রহী হইবেন তাহা লইয়া সংশয় আছে। অনুর্বর অঞ্চলে জমির মূল্য নাগালের মধ্যে থাকিলেও সেখানে কিন্তু শিল্প গড়িয়া উঠিবার জন্য পরিকাঠামো এখনও তৈরি হয় নাই। পূর্বতন সরকার শিল্পায়ন শিল্পায়ন করিয়া বাজার মাত করিলেও অনুর্বর অঞ্চলে শিল্প স্থাপনে তাহাদের মনোযোগ ছিল না এবং শিল্পপতিদের দৃষ্টি ছিল শহর বা শহরতলির দিকে অর্থাৎ সেখানে সামান্য পরিকাঠামো তৈরিতেও খরচ করিতে হইবে না। কিন্তু বর্তমানে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী শিল্পপতিরা কি করিবেন তাহা এখনও বোধগম্য হইতেছে না। বেসরকারি শিল্পপতিরা নিজেরা পরিকাঠামো তৈরি করিবেন না, সেসব তৈরি করিতে হইবে সরকারকেই। কিন্তু সরকারের কোষাগার বর্তমানে শূন্য। সরকারকে বুঝিতে হইবে শিল্পপতিরা জনস্বার্থে এইরাজ্যে কোনও দিনও শিল্পস্থাপন করিতে আসিবেন না। শিল্পপতিরা শিল্পস্থাপন করিয়া থাকেন নিজস্বার্থেই। স্বয়ং টাটাগোষ্ঠীও সিঙ্গুরে শিল্পস্থাপনে আগ্রহী ছিলেন এই কারণেই। তাহা হইলে এখন উপায় কি?

নির্বাচনী ইস্তাহারে তৃণমূল কংগ্রেস বলিয়াছিল তাহারা মূলত ছোট ও মাঝারি শিল্পের প্রসারে উৎসাহী। এই ছোট ও মাঝারি শিল্প রাজ্যে বহু রহিয়াছে এবং পূর্ববর্তী সরকারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তাহা ধ্বংসের পথে। আজ এই ছোট ও মাঝারি শিল্পকে উৎসাহিত করিলে কর্মসংস্থানও বাড়িবে এবং সামান্য হইলেও রাজ্যের শিল্প মানচিত্রের বদল ঘটিবে। বর্তমান সরকারও তথ্যপ্রযুক্তিকে গুরুত্ব দিতেছেন। তথ্যপ্রযুক্তিকে শহর হইতে গ্রামে গ্রামে প্রসারিত করিতে পারিলে কর্মসংস্থান বাড়িবে। মুখ্যমন্ত্রী বলিতেছেন পর্যটন শিল্পকে অগ্রাধিকার দিবেন। সেই চেষ্টা তিনি করিতেছেনও। এই উদ্দেশ্য সাধিত হইলে কর্মসংস্থান হইবে। কিন্তু পরিকাঠামো গড়িয়া তুলিতে না পারিলে সেই উদ্দেশ্যও সাধিত হইবে না।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

একদিকে, নব্য ভারত-ভারতী বলিতেছেন—পতিপত্নী-নির্বাচনে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা হওয়া উচিত, কারণ যে বিবাহে আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-দুঃখ তাহা আমরা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া নির্বাচন করিব; অপরদিকে, প্রাচীন ভারত আদেশ করিতেছেন—বিবাহ ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে প্রজোৎপাদনের জন্য। ইহাই এ দেশের ধারণা! প্রজোৎপাদন দ্বারা সমাজের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের তুমি ভাগী, অতএব যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের সর্বাপেক্ষা কল্যাণ সম্ভব, তাহাই সমাজে প্রচলিত; তুমি বহুজনের হিতের জন্য নিজের সুখভোগেচ্ছা-ত্যাগ কর। একদিকে নব্যভারত বলিতেছেন—পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন করিলেই আমরা পাশ্চাত্য জাতিদের ন্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন হইব; অপরদিকে প্রাচীন ভারত বলিতেছেন—মূর্খ! অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না; সিংহ-চর্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দভ সিংহ হয়? একদিকে, নব্যভারত বলিতেছেন—পাশ্চাত্য জাতিরা যাহা করে তাহাই ভাল; ভাল না হইলে উহারা এত প্রবল কি প্রকারে হইল? অপরদিকে, প্রাচীন ভারত বলিতেছেন—বিদ্যুতের আলোক অতি প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী; বালক, তোমার চক্ষু প্রতিহত হইতেছে, সাবধান!

—স্বামী বিবেকানন্দ।

এফ সি আই নির্ধারিত মূল্যের ৩০ শতাংশ কমে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন কৃষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সর্বভারতীয় সংবাদ সংস্থার তথ্য অনুযায়ী কেন্দ্র চাষীদের থেকে সরাসরি ধান কেনার দাম প্রতি ১০০ কেজিতে (১ কুইন্টাল) ১০৮০ টাকা বেঁধে দেওয়া হলেও দেশের বহু রাজ্যে 'ফুড করপোরেশন অফ ইন্ডিয়া' চাষীকে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে ৩০ শতাংশ কম দাম দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রেরিত একটি দল বিহার, উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যে গত সপ্তাহে সরেজমিনে সফর করে— এই হতাশজনক পরিস্থিতি প্রকাশ্যে এনেছে।

এই রাজ্যগুলিতে ধান সংগ্রহ এমনিতেই কম হওয়ায় চাষীরা আতঙ্কিত হয়ে এই আপতকালীন বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে এলাহাবাদের রাইয়া অঞ্চলের চাষীরা ১ কুইন্টাল ধান বিক্রি করে এফ সি আই-এর থেকে ৮০০-৮৫০ টাকা পাচ্ছে। আবার নিকটবর্তী সুলতানপুরের রামগঞ্জে ওই ধান কুইন্টাল প্রতি ৭৭৫-৮২৫ টাকায় বিকোচ্ছে। বিহারের মজফঃরপুর থেকে মোতিহারির বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এফ সি আই-এর সংগ্রহ মূল্য ৮০০ থেকে ৮৫০ এর মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে।

কমিশন ফর এগরিকালচারাল কস্ট অ্যান্ড প্রাইসের (CAP) পরিদর্শক দলটি বিহারের ২০টি সংগ্রহ কেন্দ্রে গিয়ে চাষীদের দূরবস্থা সরেজমিনে দেখে তাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন। ঘোষিত তথ্য অনুযায়ী বিহারের বহু চাষীই পরিদর্শকদের কাছে তাদের ধান কেনার জন্য সরকারি কোনও সংস্থার হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন।

সরকার নির্ধারিত দামকে তুড়ি মেরে এফ সি আই-এর চাষীদের কম দামে আপতকালীন ধান বিক্রিতে বাধ্য করার এই হতাশাজনক তথ্য নিয়ে পূর্বে উল্লেখিত কমিশনের সদস্যরা শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বসবেন।

সংবাদে প্রকাশ এই সংক্রান্ত বিস্তৃত খোঁজখবরের জন্য এফ সি আই-এর চেয়ারম্যান সিরাজ হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। উত্তরপ্রদেশের খাদ্য বিভাগের এক প্রমুখ আধিকারিক জানিয়েছেন তাঁরা এখনও কেন্দ্রের তরফে কোনও বার্তা পাননি। সি এ সি পি-র চেয়ারম্যান অশোক গেহলট অবশ্য সংস্থার পক্ষে তাঁর আধিকারিকদের উত্তরপ্রদেশ ও বিহার এই দুই রাজ্য সফর করার খবর সঠিক বলেই সংবাদ সংস্থাকে জানান।

রাজস্থানে 'রেগা' কর্মসূচিতে শ্রমিকরা ১০০ টাকার বদলে ১ টাকা পাচ্ছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ 'মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পের' (রেগা) আওতায় থাকা রাজস্থান ও কর্নাটকের গরীব চাষীরা তাদের জন্য নির্ধারিত দৈনিক ১০০ টাকার পরিবর্তে অনেকক্ষেত্রেই মাত্র ১ থেকে ১০ টাকা পেয়ে প্রতারিত হচ্ছেন বলে জানা গেছে। বহু আলোচিত গ্রামাঞ্চলে চাষীদের শ্রমের বিনিময়ে দৈনিক ১০০ টাকা দেওয়ার কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিশ্রুতিকে এইভাবেই অনায়াসে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে রাজস্থান সরকার। এর ফলে এমন একটি গালভরা নিশ্চয়তা প্রকল্প আজ কেবল ধোঁকায় পর্যবসিত হয়েছে।

প্রকল্পটির মূল নির্যাস অনুযায়ী দেশের গ্রামাঞ্চলে থাকা যে কোনও নাগরিক আইনত ১০০ টাকা মজুরির ভিত্তিতে ন্যূনতম ১০০ দিনের কাজ পাওয়ার অধিকারী। অন্তর্তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে এক শ্রেণীর অসাধু সরকারি আধিকারিক শ্রমিকদের 'কাজের উৎকর্ষ যাচাই' নামের একটি মনগড়া নিয়ম ঢুকিয়ে দিয়ে গ্রামীণ শ্রমিকদের নিশ্চিত পাওনা ১০০ টাকা মজুরিকে কমিয়ে, কোথাও কোথাও ১ থেকে ১০ টাকার মতো হাস্যকর ও জীবনধারণের পক্ষে অনুপযুক্ত স্তরে নামিয়ে এনেছে। ন্যূনতম মজুরি ১০০ টাকার বিষয়টিকে উড়িয়ে দেওয়ার ফলে সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ এক শ্রেণীর আমলার মর্জিমাফিক চলছে। কাজের উৎকর্ষ নির্ধারণের মাপকাঠিটি আমলাদের মনগড়া হওয়ায় একান্তই অস্বচ্ছ। তাই অনায়াসেই তারা 'কাজ ঠিকমতো হয়নি' বলে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরির টাকা লুঠ করে নিজেদের আখের গোছাচ্ছে। সম্প্রতি 'মজদুর কিষাণ শক্তি সংগঠন' নামের একটি সংস্থার পরিচালিত সমীক্ষা অনুযায়ী রাজস্থানের ৩৩টি জেলার ২৪৯টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ৩৭টি পঞ্চায়েতে ২০১১-১২ সালের অর্থবর্ষে পাওনা ১০০ টাকার বদলে ১ থেকে ১০ টাকা দেওয়া হয়েছে। সমীক্ষায় আরও জানা গেছে, শুধু 'টঙ্ক' জেলাতেই বহু শ্রমিককে নামমাত্র ১ টাকা মজুরি দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকদের মজুরি প্রদানের মূল নথিটি (Master Roll) ঘেঁটে দেখা গেছে— এই জুয়াচুরি কাণ্ড গোটা রাজস্থানেই সংক্রামিত হয়ে গেছে। নমুনা সমীক্ষার আওতায় থাকা ২৪৯টি পঞ্চায়েতের মধ্যে মাত্র ৭টি পঞ্চায়েত ৯১-১০০ টাকার নির্ধারিত মানদণ্ড ছুঁতে পেরেছে।

স্বস্তিকা

প্রতি সংখ্যা ৭.০০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫.০০ টাকা
(সডাক, পূজা সংখ্যা সমেত)

পড়ুন ও পড়ান

‘হিন্দু সন্ত্রাস’ প্রমাণে ব্যর্থতায় উদ্বেগে তদন্তকারী সংস্থাগুলো

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ‘হিন্দু সন্ত্রাসে’র সাজানো গল্পটা এখন ‘মাঠে মারা’ যাবার উপক্রম। কারণ এনিয়ে ‘প্রমাণ’ যোগাড় করতে নাস্তানাবুদ তদন্তকারী সংস্থাগুলো। স্বামী অসীমানন্দের রাষ্ট্রপতি-কে লেখা চিঠিতে তাঁর ওপর অমানবিক অত্যাচার চালিয়ে মিথ্যা স্বীকারোক্তি আদায়ের কথা প্রকাশ্যে আসার পর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সি বি আই, এন আই এ এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য পুলিশ ঘনিষ্ঠ মহলে স্বীকার করে নিয়েছে মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণ কাণ্ডে অসীমানন্দ যে নামগুলো ফাঁস করে দিয়েছেন বলে সংবাদমাধ্যমে খবর হয়েছিল পাঁচ বছর তদন্ত চালিয়েও তাদের বিরুদ্ধে ন্যূনতম অপরাধসূত্রের হদিশ করতে পারেনি তারা। এই ব্যর্থতায় তদন্তকারী সংস্থাগুলি উদ্বেগ বোধ করছে। শুধুমাত্র অসীমানন্দের তথাকথিত ‘স্বীকারোক্তি’র ওপর ভিত্তি করে যে চার্জশীট দাখিল করা হয়েছিল এখন সেই ‘স্বীকারোক্তি’-ই অস্বীকার করায় ওই চার্জশীটেরও কোনও মূল্য থাকলো না। ২০০৬-এ মালেগাঁও বিস্ফোরণ কাণ্ডে মহারাষ্ট্রের এ টি এস আধিকারিকেরা স্বামী অসীমানন্দের তথাকথিত ‘স্বীকারোক্তি’র ওপর ভিত্তি করে নয় যুবককে গ্রেপ্তার করেছিলেন। দীর্ঘদিন টালবাহানা করেও এদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরণ কাণ্ডে জড়িত থাকার কোনও প্রমাণ

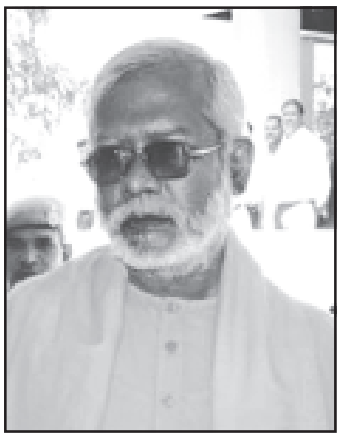

অসীমানন্দ

আদালতে এন আই এ দাখিল করতে না পারায় আদালত সম্প্রতি ওই যুবকদের জামিনও দিয়েছে। সরকারি তরফে জানানো হয়েছে, পুরো ঘটনায় বিরক্ত এন আই এ (ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি) মহারাষ্ট্রের এ টি এস (অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড)-এর সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের এবিষয়ে ভূমিকা খতিয়ে দেখতে চাইছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন এর ফলে অসীমানন্দ তাঁর ওপর অমানবিক অত্যাচারের মাধ্যমে ‘স্বীকারোক্তি’ আদায়ের যে অভিযোগ রাষ্ট্রপতিকে লেখা চিঠিতে করেছেন, তা সত্য বলে মেনে নিতে আর বাধা রইলো না।

তথ্যাভিজ্ঞ মহল এই পরিপ্রেক্ষিতে মনে করছেন, অত্যুৎসাহের বশে এন আই এ একের পর এক ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় কেস দিয়ে গেলেও তার প্রমাণ জোগাড় করতে পারছে না। আর এই না পারার কারণেই তারা চাপে পড়ে যাচ্ছে। যেমন মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণের ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ বি (অপরাধমূলক চক্রান্ত), ৩২০ (খুন), ৩০৭ (খুনের চেষ্টা), ৩২৩ (যন্ত্রণাদায়ক আহত) প্রভৃতি ধারায় অভিযোগ আনলেও একটা অভিযোগও প্রমাণ করতে পারেনি। একইভাবে সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণের ঘটনাতেও ১২০বি, ৩০২, ৩০৭, ৩২৪ ও ৩২৬ ধারায় অভিযোগ এনেও তা প্রমাণ করা যায়নি।

রাজনৈতিক মহল এও মনে করছে, দ্বিগ্বিজয় সিং, কপিল সিবাল, মণীশ তেওয়ারির মতো সোনিয়া গান্ধীর ধামাধরা নেতাদের প্ররোচনায় ও মদতে মনমোহন সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে ‘হিন্দু-সন্ত্রাসে’র গল্প বাজারে আমদানী করলেও তা ধোপে টেকানোর মতো ন্যূনতম ‘প্রমাণ’ যোগাড় করতেও ব্যর্থ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো।

প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে কংগ্রেস : জেটলি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কংগ্রেসের সম্প্রতি ঘোষিত অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর কোটা থেকে মুসলিমদের জন্য ৪.৫ শতাংশ কোটা ছিনিয়ে নিয়ে সংরক্ষণ করার তীব্র বিরোধিতা করেছেন বিজেপি নেতা অরুণ জেটলী। ক্ষমতায় এলে এই সংরক্ষণ বিজেপি খারিজ করে দেবে, এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্য সভার বিরোধী দল নেতা। এরপরেও অনগ্রসর শ্রেণীর মূল কোটা থেকে মুসলমানদের জনসংখ্যার অনুপাতে বাড়তি সংরক্ষণ দেওয়ার কংগ্রেসী প্রতিশ্রুতির তীব্র বিরোধিতা করে শ্রী জেটলী বলেছেন, এই ভাবে কংগ্রেস ‘‘প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সাম্প্রদায়িকতাকে’’ প্রশ্রয় দিচ্ছে।

কংগ্রেসের প্রকাশিত ‘দিশা দলিল’-এর (Vision Document) ওপর প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তিনি বলেন, আদতে এটি ‘বিভাজন দলিল’ (Division Document)। ধর্মের

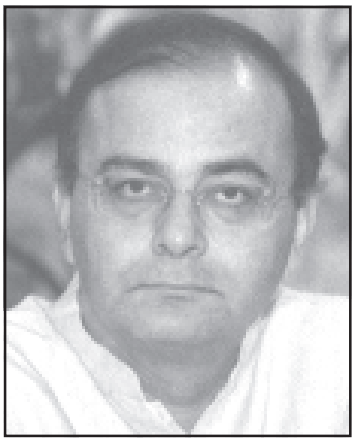

ভিত্তিতে মুসলিম সংরক্ষণ করার এই নির্লজ্জ চেষ্টাকে পুনর্বিবেচনা করার জন্য তিনি কংগ্রেসকে অনুরোধ জানান। শ্রী জেটলীর বয়ান অনুযায়ী কংগ্রেসের এই প্রয়াসে জাতীয় স্বার্থ তো নয়ই, কোনও রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ করবে না। শ্রী জেটলী গভীর ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলেছেন, কংগ্রেসের এই প্রস্তাব আদতে ‘বিশ্বাস তথা ধর্মভিত্তিক সংরক্ষণ’ যা দেশের সংবিধান-বিরোধী। এই বিভেদমূলক প্রস্তাব অনগ্রসর শ্রেণীর স্বার্থের ওপর আঘাত হানবে। পরিণামে অনগ্রসর শ্রেণীর প্রতি এই বঞ্চনা তাদের বিক্ষুব্ধ করে সমাজে চরম অস্থিরতার সৃষ্টি করবে।

মুসলিম সংরক্ষণের এই পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই ভারতীয় জনতা পার্টিকে ক্ষুব্ধ ওবিসি-দের পক্ষ নিতে বাধ্য করেছে। উত্তরপ্রদেশের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মুসলিম ভোট কব্জা করতে সমাজবাদী পার্টি, মায়াবতীর বি এস পি-র সঙ্গে তাল মিলিয়ে বা একে অপরকে ছাপিয়ে যেতে কংগ্রেস যে পদ্ধতি নিয়েছে তার নিন্দা করেই ‘‘প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার’ কথাটি প্রয়োগ করেছেন শ্রী জেটলী।

মণিপুরে ৮০ শতাংশ ভোট

কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা

ভারতের পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের পর্ব শুরু হয়ে গেছে। গত ২৮ এবং ৩০ জানুয়ারি ভোট গ্রহণ করা হয়েছে মণিপুর, পাঞ্জাব এবং উত্তরাখণ্ড রাজ্যে। বাকি দুটি রাজ্য উত্তরপ্রদেশ এবং গোয়াতে ভোট নেওয়া হবে ফেব্রুয়ারি ও মার্চে। তবে পাঁচটি রাজ্যেই ভোটের ফলাফল একত্রে জানা যাবে ৬ মার্চ। আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে যে চলতি ২০১২ সালেই বিজেপি শাসিত দুটি রাজ্য গুজরাত এবং হিমাচল প্রদেশের বিধানসভার নির্বাচন হবে। নিশ্চিতভাবেই গোয়া, মণিপুর, পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড এবং বিশেষভাবে উত্তর প্রদেশের নির্বাচনী ফলাফল প্রভাব ফেলবে গুজরাত ও হিমাচল প্রদেশের নির্বাচনে। আবার ২০১২ সালের সাতটি রাজ্যের নির্বাচনের জয় পরাজয় স্থির করবে ২০১৪-তে কেন্দ্রে কোন দলের জোট সরকার ক্ষমতায় আসছে।

এবার পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচনের চেহারাটা কেমন দেখা যাক। মণিপুরে প্রথম ভোট গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের এই অশান্ত রাজ্যে অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। ভারত বিরোধী সমস্ত জঙ্গি সংগঠনগুলি একযোগে ভোট বয়কটের হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু সেই হুমকি অগ্রাহ্য করে মণিপুরের ৮০ শতাংশ ভোটদাতারা সাহসের সঙ্গে ভোট দিয়েছেন। ভোটের ফলাফল কী হবে অথবা কোন রাজনৈতিক দল বা জোট ক্ষমতায় ফিরবে তার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মণিপুরের মানুষের গণতন্ত্রে আস্থা। তাঁদের পক্ষ থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গি সংগঠনগুলিকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া যে মণিপুর ভারতেরই একটি অঙ্গরাজ্য। তাঁরা বুলেট নয়, ব্যালেটেই আস্থা রাখেন। এমনভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কড়া চ্যালেঞ্জ দ্বিতীয় কোনও একটি রাজ্য সাম্প্রতিককালে জানায়নি। হ্যাঁ, ৮০ শতাংশ মণিপুরের মানুষ জানিয়ে দিয়েছেন যে তাঁরা গণতন্ত্রেরই পক্ষে। উত্তর-পূর্ব ভারতের সন্ত্রাস কবলিত অন্যান্য ছোট ছোট রাজ্যে মণিপুরের বার্তার জোর প্রভাব পড়বে তাতে সন্দেহ নেই। পাঞ্জাব এবং উত্তরাখণ্ডের নির্বাচনে সেখানের সাধারণ মানুষ যেভাবে সাড়া দিয়েছেন তাতে স্পষ্ট যে গণতন্ত্রের ভিতটি এখন যথেষ্ট মজবুত। দুর্নীতির ঘুণ পোকা, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদির আক্রমণ ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিতকে নড়বড়ে করতে পারেনি। বরং আঘাত যতই তীব্র হয়েছে, প্রতিরোধও ততই কঠিন হয়েছে। নকশালবাদ, মাওবাদ, জেহাদ সব আঘাত গণতন্ত্রে আস্থাবান মানুষের দৃঢ় প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছে। মনে রাখতে হবে, ভারতের লাগোয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে গণতন্ত্র নেই অথবা থাকলেও সেই গণতন্ত্রের ভিত মোটেই শক্তপোক্ত নয়। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতই একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে সংসদীয় গণতন্ত্রের শিখা অনির্বাণভাবে জ্বলছে। চীন ও পাকিস্তানের সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও সেই শিখা নেভানো যায়নি। যাবেও না। অশান্ত মণিপুরের মানুষ সেই বার্তাটি চীন, পাকিস্তান এবং মায়ানমারের স্বৈরাচারীদের জানিয়ে দিয়েছেন। তাই বলছি, মণিপুর সহ পাঁচটি রাজ্যে নির্বাচনের ফলাফল থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষের আস্থা জানানো।

চলতি ২০১২ সালে দেশের যে সাতটি রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচন হবে অথবা হয়েছে তার মধ্যে চারটি রাজ্যে বিজেপি জোট ক্ষমতায় আছে। এই চারটি রাজ্য হচ্ছে পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ ও গুজরাত। কংগ্রেস বা তার জোট ক্ষমতাসীন আছে গোয়া ও মণিপুরে। একমাত্র উত্তরপ্রদেশে মায়াবতীর আঞ্চলিক দল বহুজন সমাজবাদী পার্টি পাঁচ বছর শাসন ক্ষমতায় আছে। দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র এবং টিভি চ্যানেল খোলাখুলিভাবে দুর্নীতিপরায়ণ দল কংগ্রেসকে সমর্থন করছে। ভোট গ্রহণের বহু আগেই সংবাদমাধ্যমের পণ্ডিত সাংবাদিকরা জানিয়ে দিয়েছে যে পাঞ্জাব এবং উত্তরাখণ্ডে বিজেপির গড় ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। রাহুল গান্ধী ঘোষণাই করে দিয়েছেন রাজ্য কংগ্রেস নেতা ক্যাপ্টেন অমরেন্দ্র সিং ফের পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন। রাহুল ভুলে গেছেন যে দলের বিধায়করা তাঁদের নেতা নির্বাচন করেন। অন্তত কংগ্রেসের ঘোষিত নীতি এটাই ছিল। রাহুল এমনভাবে কথাবার্তা বলছেন যে দল নয়, নেতা নির্বাচন তিনিই করেন। স্বৈরাচারী শাসকরা এইভাবেই কথা বলেন। ইন্দিরা গান্ধীও এইভাবেই কথা বলতেন। গণতন্ত্রের পক্ষে এই মনোভাব শুভ নয়। ইতিহাস সাক্ষী দেবে একদা গণতন্ত্রের মুখোশের আড়ালে হিটলার, মুসোলিনি, স্তালিনেরাও তাঁদের রাষ্ট্রে একনায়কতন্ত্র কায়েম করেছিলেন। সোনিয়া-রাহুল গান্ধীর কংগ্রেস এখন সেই পথেই হাঁটছে। খারাপ লাগে যখন দেখি সংবাদমাধ্যম গণতন্ত্রের পরিবর্তে স্বৈরাচারী শাসনের সমর্থনে প্রচার চালাচ্ছে। তবে একটা কথা সাংবাদিকদের মনে রাখা উচিত যে অপপ্রচার সাময়িকভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকাল নয়। মণিপুরের নির্বাচন থেকে সাংবাদিকদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। ভোটের আগে সাংবাদিকরা একযোগে লিখেছিলেন সন্ত্রাসবাদীদের হুমকির ফলে ভোটদাতারা আতঙ্কে ভোট দিতে যাবেন না। বাস্তবে দেখা গেল হুমকিকে উপেক্ষা করে ৮০ শতাংশ ভোটদাতা তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে জানিয়ে দিলেন যে সংবাদমাধ্যম নয় তাঁরাই শেষ কথা বলেন। তাই সাংবাদিকদের বলছি, রাজনৈতিক দলের স্বার্থে কলম ধরবেন না।

দেশের মানুষের স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে, গণতন্ত্রের স্বার্থে কলম ধরুন।

গূঢ়পুরুষের

কলম

পার্টি সম্মেলনগুলিতে সিপিএম নেতৃত্ব উলঙ্গ হয়ে গেছেন!

নিশাকর সোম

রাজ্য-রাজ্যনীতি শুরু করার আগে এই জানুয়ারি মাসের তিনটি তারিখ সম্পর্কে কিছু কথা না বলে থাকা যাচ্ছে না। (১) ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ-এর জন্মদিন। তিনি বলেছিলেন— ''উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত''। এই মন্ত্রে তিনি যুব সম্প্রদায়কে উঠে দাঁড়াতে বলেছিলেন। অথচ আজ এই যুবসমাজকে অপ-সংস্কৃতির বেড়াজালে পঙ্গু করে ফেলা হচ্ছে যাতে তাঁরা উঠে দাঁড়াতে না পারে।

২৩ জানুয়ারি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন। সুভাষচন্দ্রকে কমিউনিস্টরা দেশদ্রোহী কুইসলিং বলেছিল, অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র পিপলস ওয়ার-এ 'তোজোর কুকুর হিসাবে' দেখানো হয়েছিল। কিন্তু ভোট পাবার জন্য প্রথম সাধারণ নির্বাচনের আগে অবিভক্ত কমিউনিস্ট ডিগবাজি খেয়ে কলকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে (বর্তমান সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির তদানীন্তন সাধারণ-সম্পাদক এ ব্যাপারে দোষ স্বীকার করেছিলেন।

২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ ভারতের নতুন সংবিধান চালু হলো। কমিউনিস্টরা স্লোগান দিল, 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়। আগ লাগাও এ-ঝুটি আজাদী কো আগ লাগাও।' ওইদিন কালো পতাকা উড়িয়েছিল কমিউনিস্টরা! দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে জমায়েত করার চেষ্টা করে বোমাবাজি চলে। পুলিশের গুলিতে মারা যান কলিন্স স্কুলের ছাত্র নিখিল ভাদুড়ি। এইভাবেই কমিউনিস্টদের 'দক্ষিণ কলকাতা মুক্ত' করার কর্মসূচি চলে। কিন্তু ১৯৫২-তে এই সংবিধানকে মেনে নিয়ে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে কমিউনিস্টরা। নির্দেশ আসে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে। তাই তেলেঙ্গানার মুক্তাঞ্চল-এর সশস্ত্র সংগ্রাম বন্ধ করে সরকারের নিকট অস্ত্র সমর্পণ করে গুটিগুটি নির্বাচনে দল অংশগ্রহণ করেছিল। আর বিগত ৩৪ বছরের সিপিএমের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার কৃষক-শ্রমিক বিরোধী নীতি নিয়ে টাটাদের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছিল। সিপিএমের তিন/চার দশক-এর শাসনের কীর্তিকলাপ নিয়ে পার্টির বিভিন্ন সম্মেলনে তীব্র সমালোচনা উঠেছে। তবে এটাও ঠিক পার্টি কংগ্রেস হয়ে যাবার পর বহু জেলা-কমিটির সম্পাদক পরিবর্তন হবেই। ইতিমধ্যে নদীয়া জেলা, মালদহ জেলায় হয়ে গেছে।

এদিকে সংবাদপত্রে প্রকাশ হচ্ছে— সমস্ত কৃত অপকর্মের প্রধান নায়ক পরাজিত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নাকি 'স্বাস্থ্য-এর কারণে' পার্টির সর্বভারতীয় সম্মেলন অর্থাৎ পার্টি কংগ্রেসে যাবেন না। তিনি যাবেন কি করে? সেখানে তো তাঁকে অন্য রাজ্যের প্রতিনিধিগণ ছেড়ে দেবেন না— তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিনিধিগণ বলবেন 'সমগ্র দেশের বামপন্থীদের সর্বনাশ করে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে পার্টি আর তার নেতারা।' এই হলো সিপিএম শিবিরের কথা। রাজ্য-সিপিএম নেতৃত্বের রাজনৈতিক-সাংগঠনিক আবরণ খসে গিয়ে উলঙ্গ হয়ে গেছে।

অপর শিবির অর্থাৎ প্রধান শাসক দল তৃণমূল-এর অবস্থাটা দেখা যাক। নেত্রী মন্ত্রীদের দপ্তর রদবদল করেছেন। সব থেকে বেশি উত্তরণ ঘটেছে পরিবহণ মন্ত্রী হিসাবে মদন মিত্রের। আবাসনমন্ত্রীকে সাহায্য (গার্ড) করার জন্য একজনকে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, রাজ্যের মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিব পদেও পরিবর্তন হতে চলেছে। আই পি এস নজরুল ইসলাম পুলিশ-অফিসারদের প্রমোশন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন! নেত্রী কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের হাত থেকে অ্যাসেসমেন্ট ট্যাক্স, বস্তি এবং মার্কেট দপ্তর কেড়ে নিয়েছেন। এর মধ্যে অ্যাসেসমেন্ট ট্যাক্স এবং মার্কেট দপ্তর আর্থিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এর সঙ্গেই ফিরহাদ হাকিম (ববি)-এর উন্নতি হবেই। পুরমন্ত্রী হিসাবে তাঁর পরামর্শে কি মেয়রের এই ডানা ছাঁটা। এসবের ফলে একদিকে মন্ত্রিসভায় গুঞ্জন শুরু হয়েছে। তার প্রভাব দলের অভ্যন্তরে উঠবেই। প্রশাসন-এর ক্ষেত্রে বিশেষ করে আই এ এস এবং আই পি এস ক্যাডাররা মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে হতাশ হচ্ছেন।

ডানা-ছাঁটা মেয়রকে দেখা গেছে মুখ্যমন্ত্রীর ছায়াসঙ্গী হিসাবে। তাঁর এই অবনমন তাঁকে বিরক্ত করছে। তিনিও চেষ্টা করবেন যাতে তিনি এ কাজের বিরুদ্ধে গুমে গুমে ধিকি ধিকি জ্বলতে পারেন।

অপরদিকে তৃণমূল-কংগ্রেস জোটের খবরও জটিল। কংগ্রেস-এর মন্ত্রী মনোজ চক্রবর্তীর পদত্যাগ কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব অনুমোদন করেছেন। সেই জায়গায় কংগ্রেস কোনও নতুন মন্ত্রী দেবে না। পাঠকগণ এ পর্যন্ত জানেন এবং এভাবেই কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জয়রাম রমেশ সম্প্রতি বলেছেন— ''১০০ দিনের কাজ এরাজ্যে পরিপূর্ণ রূপে হয়নি।'' তিনি আরও বলেছেন— ''পরিবর্তন আনার কৃতিত্ব তৃণমূলের একার নয়।'' এদিকে পরিবহনের এক কর্মী আত্মহত্যা করেছেন। প্রয়াত পরিবহনমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী পরিবহন দপ্তরকে নিজের জমিদারিতে পরিণত করেছিলেন। সিপিএম নেতৃত্ব কিছুই দেখেনি? পরিবহন দপ্তরের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেছেন। এর ফল ভুগবেন দরিদ্র পরিবহন কর্মীরা। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনও সিটুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আন্দোলনে নামবে। তখন আর এক বিশৃঙ্খল অবস্থা ঘটবে।

তৃণমূল মালদহে কংগ্রেসকে ভেঙে দেবার চাল চেলেছে। মুর্শিদাবাদে অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে কংগ্রেসের মধ্যে ঘোঁট পাকাতে মদত দিচ্ছে। অথচ তৃণমূলের মধ্যেও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রবল। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এই দলাদলি প্রকট। উল্লেখ করা দরকার দক্ষিণ ২৪ পরগণার তৃণমূল সংগঠন দেখভালের দায়িত্ব কলকাতার মেয়র শোভনবাবুর। এর পরও কি জোট টিকবে— এই প্রশ্নটার জবাব পাওয়া যাবে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের পরে।

এদিকে মালদহ জেলায় শিশুমৃত্যু, রাস্তায় সন্তান প্রসব— বস্তুত সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা টলমল। প্রশাসন কে দেখবেন। নেত্রী তো অখিল ভারতীয় দল করার জন্য ঘুরবেন? স্বাস্থ্যদপ্তর দেখবেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। বামফ্রন্টের আমল থেকেই অর্থাৎ সূর্যবাবুর সময় থেকেই রাজ্যের স্বাস্থ্য ক্রমাগত অবনতির পথে গেছে। মুখ্যমন্ত্রীর হাসপাতাল পরিদর্শন এবং বিভিন্ন সভাতে 'হুমকির' পর সরকারি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসকগণ পদত্যাগ করতে চলেছেন। রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক জটিলতা বাড়ছে। সাম্প্রতি শিশুমৃত্যু নিয়ে রাজ্যপালের দুঃখ-উদ্বেগ প্রকাশে মুখ্যমন্ত্রী উষ্মা প্রকাশ করে বলেছেন— ''আমি বাঘা তেঁতুল''। এর পরেই ২৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী গাড়ি থেকে হঠাৎ নেমে হেঁটে হেঁটে অনুষ্ঠানস্থলে গিয়ে রাজ্যপালকে বসে থাকতে বাধ্য করলেন। এভাবেই তিনি রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। অথচ তিনি যখন বিরোধী নেত্রী ছিলেন তখন তদানীন্তন রাজ্যপাল গোপাল গান্ধী বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে মন্তব্য করলে নেত্রী পুলকিত হয়ে রাজ্যপালের কাছে বার বার ছুটে গেছেন। এ কারণেই সিপিএমের বিভিন্ন জেলা সম্মেলনে বিশেষ করে হুগলি জেলা সম্মেলনে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে সমালোচনা করে বলা হয়েছে— তিনি রাজ্যপালকে কেন মধ্যস্থ মেনে ছিলেন? ঘটনা হচ্ছে 'তুষার বল' গড়াতে গড়াতে বড় হয়ে যায়।

দর্শনের নাম 'গীতা'

'গীতা'র সারবস্তু 'দর্শন', কোনও ধর্মীয় শিক্ষা নয়— এই মর্মে রায় দিয়ে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট স্কুলপাঠ্যে 'গীতা সার' অন্তর্ভুক্ত করার বিরুদ্ধে আবেদনকে সরাসরি খারিজ করে দিল। গত ২৭ জানুয়ারি এই রায় দেবার পাশাপাশি উচ্চ আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, যে কোনও ভারতীয় এমনকী বিশ্বের অন্যান্য দেশের নাগরিকদের ক্ষেত্রেও 'গীতা'র দর্শনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভারতের সনাতন ধর্ম হিন্দুধর্মকে সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে কং-কম্যুনিস্ট-মুসলিম মৌলবাদী আঁতাঁত বাধাপ্রাপ্ত হলো মধ্যপ্রদেশ উচ্চ আদালতের এই রায়ে।

দেশপ্রেমের অনন্যসাধারণ কোরাস

গত ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদে প্রায় হাজার পঁয়ত্রিশ মানুষ একই পর্দায় (সাঙ্গীতিক পরিভাষায় 'স্কেল') গাইলেন জাতীয় সঙ্গীত। সেইসঙ্গে ভেঙে গেল তার আগের দিনই গড়া আরেকটি রেকর্ড। গত ২৫ জানুয়ারি এই ঔরঙ্গাবাদেই ১৫,০০০-রও বেশি মানুষ 'জনগণমন অধিনায়ক' কোরাস গেয়েছিলেন। গিনেস বুক অব্ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে ১৫,২৪৩ জনের সমবেত জাতীয় সঙ্গীত-ই ঠাঁই পেয়েছে 'রেকর্ড' হিসেবে এবং তা পাকিস্তানের ৫৮০০ জনের 'রেকর্ড'-কে টপকেই। তবে তার পরের দিন-ই ৩৫০০০ মানুষের সমবেত জাতীয় সঙ্গীতে সেই রেকর্ড ভেঙে গেলেও গিনেস বুক অব্ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে এই নবতম রেকর্ডটির ঠাঁই হয়নি আপাতত। রেকর্ড হোক আর না-ই হোক, দেশপ্রেমের যে স্ফূরণ প্রজাতন্ত্র দিবসের দিনে ও প্রাক্কালে প্রত্যক্ষ করলো ঔরঙ্গাবাদ, তা নিঃসন্দেহে অনন্য।

মোদী-র প্রশংসায় কংগ্রেস

নরেন্দ্র মোদী একজন ''কুশলী সংগঠক এবং বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ''। না, মোটেও ভাববেন এটা বিজেপির প্রচার। গত ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন গুজরাটের বিভিন্ন সংবাদপত্রে কংগ্রেস দলের তরফে দেওয়া বিজ্ঞাপনের অংশ এটি। যে দলের সুপ্রিমো একদা এই মোদীকেই 'মৃত্যুর সওদাগর' বলে উপহাস করেছিলেন এবং তাঁর চ্যালা-চামুণ্ডারা যেখানে মোদীকে প্রতিদিন সকালে-বিকেলে উঠতে-বসতে গালাগাল না দিয়ে জলস্পর্শ করেন না সেই দলের এহেন 'পরিবর্তনে' বিস্মিত রাজনৈতিক মহল। কোনও

কোনও মহল একে কংগ্রেসের 'সৌজন্য' বলে দেখাবার চেষ্টা করলেও প্রশ্ন থাকছে, গত একদশক এই সৌজন্য কোথায় ছিল? একদশক পরে 'সৌজন্য'-এর প্রয়োজন পড়লো ঠিক কি কারণে?

গাফিলতির 'পাপস্খলনে' স্মৃতিফলক

বিগত ২০১১ সালের ১১ জানুয়ারি শীতের সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে আর ফেরেননি আরতি সেনগুপ্ত। কলকাতা পুরসভার ৫নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত টালা ঝিল পার্কের ভিতরেই পুরসভার লরির আঘাতে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় তাঁর। প্রসঙ্গত টালা ঝিল পার্কের ভিতরে যে কোনও ধরনের গাড়ীর প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই ঘটনার বিরুদ্ধে বিগত ১ বছর আরতি দেবীর পরিবারের পক্ষ থেকে সর্বস্তরে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কলকাতা পুরসভা তাদের গাফিলতি স্বীকার করেছে এবং হতভাগ্য পরিবারটির বক্তব্যের যৌক্তিকতা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। পরিবারটির ইচ্ছানুসারে এই বছর ১১ জানুয়ারি পার্কের ভিতরে ওই স্থানেই স্বর্গীয়া আরতিদেবীর স্মরণে একটি স্মৃতিফলক স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও দোষী লরিচালক এবং কর্তব্যে গাফিলতির জন্য পার্কের নিরাপত্তারক্ষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার মৌখিক প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন পুরকর্তৃপক্ষ। সেইসঙ্গে পার্কের ভিতর গাড়ির প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাও তাঁরা মেনে নিয়েছেন। এই লড়াইয়ে আরতিদেবীর পরিবারের পাশে সবসময় ছিল ভারতীয় জনতা পার্টি। স্মৃতিফলকের আবরণ উন্মোচনের অনুষ্ঠানে পার্টির স্থানীয়, জেলা এবং রাজ্যস্তরের যুব নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষক আত্মহত্যা

ঋণের দায়ে চাষিরা আত্মহত্যা করছে— রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একথা মানতে না চাইলেও বাস্তব ঘটনা হলো, চাষিরা ফসলের জন্য টাকা ঋণ নিয়ে শোধ করতে না পেরেই আত্মহত্যা করছেন। সম্প্রতি মালদা জেলায় পর পর দুজন কৃষক ঋণ শোধ করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন। গত ১২ জানুয়ারি হবিবপুর ব্লকের আগ্রা হরিশচন্দ্রপুরে কৃষক হরিদাস রত্ন (৫৫) গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। বিডিও অভিজিৎ ঘোষ এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে তার ঋণ মকুবের সুপারিশ করেছেন। ১৪ জানুয়ারি বিডিও তার বাড়িতে গিয়ে রিপোর্ট সংগ্রহ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর অফিস থেকেও এ ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া হয়। জেলা প্রশাসনের কাছে বিডিও যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন, তাতে উল্লেখ করেছেন যে, ওই কৃষক বি পি এল তালিকাভুক্ত এবং তার পরিবার অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অসস্বচ্ছল। সমবায় ব্যাঙ্কে তার ঋণ ছিল আড়াই লক্ষ টাকারও বেশি। বিডিও এবং অতিরিক্ত জেলা শাসক জানিয়েছেন, তারা ঋণ মকুবের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন, সুপারিশ কতটা কার্যকর হবে তা রাজ্য সরকারই বলবেন। এদিকে আত্মঘাতী কৃষকের ঋণ মকুব এবং পরিবারের ক্ষতিপূরণের দাবিতে আর এস পি ও বিজেপি ইংলিশবাজার শহর ও হবিপুর ব্লকে মিছিল করে এবং স্মারকলিপি জমা দেয়। ইংলিশবাজারে বিক্ষোভ মিছিলে সারা ভারত সংযুক্ত কিষাণ সভা অংশগ্রহণ করে। স্মারকলিপিতে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতি পূরণ ও ঋণ মকুবের দাবি জানানো হয়। বিদ্যুৎ এবং জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি, কীটনাশক ঔষধের ও শ্রমিকের যোগান দিতে গিয়ে নাজেহাল চাষিরা। জেলায় জেলায় তাদের ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে আন্দোলন করছে। ফলে ঋণ করে ফসল লাগিয়ে দাম তুলতে না পেরে চাষিরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে।

সরকার কৃষকদের চাষ করতে ভর্তুকির ব্যবস্থা করলে তারা কিছুটা রেহাই পেত। কিন্তু রাজ্য সরকার তা না করে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর ঋণের দাম নির্ধারণের দায় চাপিয়ে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে চাইছেন। চাষিরা না পারছেন চাষ করতে না পারছেন চুপ করে বসে থাকতে, আবার ঋণ করে লাভের আশায় সার, কীটনাশক ঔষধ, সেচের জল দিয়ে ফসল উঠিয়ে টাকা ওঠাতে না পেরে পথে বসছেন। রাজ্য সরকার চাষীদের অভাবের এই দিকগুলি না বুঝতে পারলে আগামীদিনে আরও আত্মহত্যার ঘটনা ঘটবে।

শেয়ার মার্কেটে অনিশ্চয়তার কারণগুলি নিয়ে একটি অন্তর্তদন্ত

এন. সি. দে

২০১০-এ বারাক ওবামার ভারত ভ্রমণের সময় বিভিন্ন বরাত পাইয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। শুধুমাত্র বোয়িং-কেই দেওয়া হয় ২৮ বিলিয়ন ডলারের বরাত; তারা এবার ইন্ডিয়া, স্পাইস জেট ও জেট এয়ারওয়েজকে এয়ারক্রাফ্ট বিক্রি করবে। এর ফলে ওই দেশে ২, ৮০,০০০ জনের কর্মসংস্থান হবে। এছাড়াও ১০ বিলিয়ন ডলার বাণিজ্য চুক্তিও বাগিয়ে নিয়ে গেছে। এর ফলে ভারতের আমদানি বাণিজ্য বহুগুণ বেড়ে গেছে। ফলে বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি দেখা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে রাজস্ব ঘাটতি, রাজকোষ ঘাটতি। শিল্প উৎপাদন শূন্যের ঘরে নেমে যায়। বাজেটে দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি মিথ্যায় পর্যবসিত হয়েছে। এদিকে মার্কিন অর্থনীতি চাঙ্গা হওয়ায় বিদেশী পুঁজি ফিরে যেতে শুরু করায় দেশীয় মুদ্রা টাকার দাম কমতে শুরু করেছে। শেয়ার বাজার-এ শুরু হয়েছে ধস নামা।

২০০৪ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রিত্বে পরিচালিত ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স সরকারের প্রস্থান ঘটে এবং আগমন ঘটে বিদেশিনী চালিত কংগ্রেস দলের 'পুতুল প্রধানমন্ত্রী' মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স সরকারের। শুরু থেকেই এই সরকারের প্রতিটি পলিসির মধ্যে দিয়ে আমাদের দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে ফুটে উঠেছে বিদেশী প্রভাব। অর্থাৎ সহজ ভাষায় বলতে গেলে এই সরকার বিদেশের কাছে করে চলেছে নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ। ক্ষমতায় আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডব্লু টি ও-র বৈঠকে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের অবাধ বাজার দখলের স্বার্থে তাদের অনুকূলে চুক্তি করে আসে। ২০০২ সালে ডব্লু টি ও-র দোহা সম্মেলনে বাজপেয়ী সরকার ইঙ্গ-মার্কিনীদের কাছে নতিস্বীকার করে যে চুক্তি পাশ হতে দেয়নি, এই কংগ্রেস জোট সরকার সেই চুক্তি পাশ করে দিয়ে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে শুরু করে ভারতীয় জাতীয় অর্থনীতির অন্তর্জলি যাত্রা। কংগ্রেসকে ক্ষমতায় বসাতে নির্বাচনে যেভাবে গণমাধ্যমগুলিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল তার বিপুল অর্থের যোগান কোথা থেকে আসছিল তা আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি। কীভাবে আসছে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ? এক বেসরকারি সমীক্ষার প্রকাশ গত ১০ বছরে প্রশাসনিক দুর্নীতির পরিমাণ ১,৫৫৫ হাজার কোটি টাকা। ২০০৮ সালে ভারত দুর্নীতির পরিমাণের বিচারে ছিল ১৮০টি দেশের মধ্যে ৮৫তম স্থানে। ২০০৯-এ আরও উপরদিকে এগিয়ে দখল করে ৭২তম স্থান। এক নম্বর স্থানটি হয়তো অচিরেই দখল করে নেবে! আর সরাসরি বিদেশ থেকে অর্থ আসছে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক সংগঠনগুলোর (NGO)-র মাধ্যমে। সাম্প্রতিক স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৪-এ কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর থেকে ২০০৯-১০ পর্যন্ত গত ৫ বছরে এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর হাতে বিদেশী অর্থ এসেছে প্রায় ৫০,০০০ কোটি টাকা। এই অর্থ প্রদানের পরিমাণের দিক থেকে শীর্ষে রয়েছে আমেরিকা, ২০০৯-১০ বর্ষে দিয়েছে ৩,১০৫ কোটির কিছু বেশি; দ্বিতীয় স্থানে থেকে জার্মানি দিয়েছে ১,০৪৬ কোটি, তৃতীয় স্থানে বৃটেন, দিয়েছে ১,০৩৮ কোটি, চতুর্থ স্থানে ইতালি, দিয়েছে ৫৮৩ কোটি এবং পঞ্চম স্থানে রয়েছে নেদারল্যান্ড, দিয়েছে ৫০৯ কোটি টাকা। এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর সংখ্যাও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। সরকারি মতে ২০০৯-১০-এ এই সংখ্যা ছিল ২১,৫০৮টি। কিন্তু বেসরকারি মতে এই সংখ্যাটি ২০০৮-০৯-এই ছিল ৩৬,৪১৪টি। চিন্তার ব্যাপার হলো, অর্থ কিন্তু আসছে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, জাম্বিয়া, কঙ্গোসহ আরও অনেক মার্কিন প্রভাবিত গরীব দেশগুলোর মাধ্যমেও।

আজকের বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত পরিসংখ্যানগুলি অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আজ কেন্দ্রীয় সরকারটি চলছে যে দলের নেতৃত্বে, সেই দলটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য না বুঝলে দেশের শেয়ার মার্কেটের অনিশ্চয়তা এবং টাকার বৈদেশিক মূল্যহ্রাস ও বৃদ্ধির দোলাচলের কারণটিও বোঝা যাবে না। কারণ বিষয়টি দেশের বর্তমান আর্থ-রাজনৈতিক অবস্থা, দেশের বর্তমান সরকারের আর্থিক নীতি, আদর্শ ও পলিসির স্বাভাবিক পরিণতি। স্বল্প পরিসরে বিষয়টির এই পরিপ্রেক্ষিতগুলিই এবার বিশ্লেষণ করে দেখাব যে জন্মসূত্রে পাওয়া চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যা স্বাভাবিক কংগ্রেস দলটি তাই করেছে এবং তার পরিণতি জাতীয় অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিয়েছে।

শুরু থেকেই কংগ্রেসী শাসনে এদেশে বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর সম্পদ প্রতি বছর লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। ১৯৯১ সালে

আর্থিক সংস্কারের নাম করে নরসীমা রাওয়ের কংগ্রেস সরকার চালু করেছে এক নয়া উপদ্রব এফ ডি আই অর্থাৎ বিদেশী কোম্পানীগুলো আমাদের দেশীয় কোম্পানীগুলোতে সরাসরি পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারবে। এই সরকারি নীতির ফলে দেশীয় কোম্পানীগুলোতে স্রোতের মতো বিদেশী পুঁজি আসতে শুরু করেছে। ২০০০ সালে যেখানে এসেছিল মাত্র ৩৬০ কোটি ডলার ২০০৯-এ এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৩৪৬০ কোটি ডলারে। বহু দেশী কোম্পানীই আজ বিদেশীদের পেটে চলে যাচ্ছে। গত ৫ বছরে ৬টি ওষুধ কোম্পানী বিদেশীদের হাতে চলে গেছে। তার প্রধান ২টি হলো র‍্যানব্যাক্সি ও ডাবর। ১৯৯৮ সালে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ডিসেম্বর মাসেই প্রেস নোট ১৮ প্রয়োগ করে বিদেশী কোম্পানীগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে দিয়েছিল যাতে তারা তাদের দেশীয় অংশীদারদের অনুমতি ছাড়া নিজস্ব কোম্পানী চালু করতে না পারে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো কংগ্রেসীরা ক্ষমতায় বসার কয়েক মাসের মধ্যেই অর্থাৎ জানুয়ারি, ২০০৫ মনমোহনজী এই প্রেস নোট বাতিল বলে ঘোষণা করে দিলেন। পরিণামে একের পর এক দেশীয় কোম্পানীতে বিদেশী পুঁজির পরিমাণ বেড়ে চলায় দেশীয় কোম্পানীগুলোর অস্তিত্ব অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়তে লাগল।

২০০৯ সালে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় বসার আগে এফ ডি আই-পলিসি পরিবর্তন করে ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ দেশীয় কোম্পানীগুলোতে বিদেশীরা এতদিন যেখানে যৌথ মালিকানায় থাকতে বাধ্য হোত, সেইসব যৌথ মালিকানার সংস্থাগুলোতে বিদেশীদের 'Indirect foreign ownership' গঠনের সুযোগ ঘোষণা করা হলো। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় তীব্র বিবাদ, বিতর্ক। কিন্তু দ্বিতীয় বারও ক্ষমতা দখল করায় কংগ্রেস চালিত ইউ পি এ সরকারের ঔদ্ধত্য আরও বেড়ে যায়। ২৪ ডিসেম্বর, ২০০৯ চালু করে 'consolidated FDI Policy document'। ২০১০-এর শুরু থেকেই একের পর এক ক্ষেত্র বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের দুয়ার উন্মুক্ত করার ঘোষণা শুরু হয়। বিদেশী পুঁজি ও পুঁজিপতিদের নানান সুযোগ-সুবিধা ঘোষণা হতে শুরু হয়। যেমন বিশাল এস্টেট ব্যবসায় বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশে অনুমতি, পাইকারি ব্যবসা ও এক ধরনের জিনিসের খুচরো ব্যবসায় যেমন জুতোর দোকান, কাপড়ের দোকান ইত্যাদিতে বিদেশী পুঁজিপতিদের অনুপ্রবেশে ১০০ শতাংশ অনুমতি প্রদান, পেনশন ফান্ডে বিদেশী পুঁজির আগমনে অনুমতি, পরিকাঠামো ও ওষুধ শিল্পে অবাধ অনুমতির পরিণামের কথা আগেই বলেছি। বহু ব্র্যান্ড অর্থাৎ মণিহারী দ্রব্যের ব্যবসায় বিদেশী পুঁজির অনুমতির চেষ্টায় ত্রুটি রাখছে না।

বিদেশীদের হাতে ভারতীয় শিল্প ও অর্থনীতিকে সর্বাত্মকভাবে তুলে দেওয়ার চক্রান্তের জঘন্যতম পদক্ষেপটি হলো দেশীয় শেয়ার বাজারে এবং স্টক এক্সচেঞ্জে বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলি (এফ ইলেভেন)-এর অংশগ্রহণে অনুমতি প্রদান। ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই দেশীয় কোম্পানীগুলিতে বিদেশী কোম্পানীগুলির পুঁজির পরিমাণ প্রায় পৌঁছে গেছে ১ লক্ষ কোটি টাকায়। ভারতীয় মালিকানা এখন বিদেশী আক্রমণের মুখে ২০১০ সালের অক্টোবরের মধ্যেই City Group, Templeton, Fidelity ও Capital International মিলিত ভাবে BSE-500 Index-এর ১৭.৮ শতাংশের মালিক হয়ে উঠেছেন বাজার দরে যার পরিমাণ ৬৯ লক্ষ কোটি বা BSE-এর মোট বাজার মূলধনের (total market capitalisation) ৯৩ শতাংশ। RBI ও SEBI এই অনিয়ন্ত্রিত বিদেশী পুঁজি নিবেশের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই সোচ্চার হয়েছিল। অর্থনীতিবিদগণও উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। তাদের মতে, এই পথে মরিশাসের মতো ট্যাক্সহীন দেশের মধ্যে দিয়ে বিপুল পরিমাণ বেআইনি অর্থ দেশের অর্থনীতিতে ঢুকছে। যা অর্থনীতিতে 'Hot Money' হিসাবে পরিচিত। এই অর্থ নিজেও অস্থির, অর্থনীতিকেও করে তুলবে অস্থির। এই অস্থির পুঁজিই অর্থনীতিকে আজ করে তুলেছে অনিশ্চিত। বেআইনি ডলারের বন্যা বয়ে যাওয়ায় দেশীয় মুদ্রার মূল্য প্রথমে যায় বেড়ে যার জেরে রপ্তানী বাণিজ্য তলানিতে ঠেকেছে। আর অন্য দিকে ডলারের দাম কমিয়ে আমেরিকা চীনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজের রপ্তানী বাণিজ্য বাড়িয়ে দেশের আর্থিক ঘাটতি অনেকখানিই সামলে নেয়। আর এ কাজে মার্কিনীদের সাহায্য করে এই কংগ্রেসী সরকার। ২০১০-এ বারাক ওবামার ভারত ভ্রমণের সময় বিভিন্ন বরাত পাইয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। শুধুমাত্র বোয়িং-কেই দেওয়া হয় ২৮ বিলিয়ন ডলারের বরাত; তারা এবার ইন্ডিয়া, স্পাইস জেট ও জেট এয়ারওয়েজকে এয়ারক্রাফ্ট বিক্রি করবে। এর ফলে ওই দেশে ২,৮০,০০০ জনের কর্মসংস্থান হবে। এছাড়াও ১০ বিলিয়ন ডলার বাণিজ্য চুক্তিও বাগিয়ে নিয়ে গেছে। এর ফলে ভারতের আমদানি বাণিজ্য বহুগুণ বেড়ে গেছে। ফলে বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি দেখা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে রাজস্ব ঘাটতি, রাজকোষ ঘাটতি। শিল্প উৎপাদন শূন্যের ঘরে নেমে যায়। বাজেটে দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি মিথ্যায় পর্যবসিত হয়েছে। এদিকে মার্কিন অর্থনীতি চাঙ্গা হওয়ায় বিদেশী পুঁজি ফিরে যেতে শুরু করায় দেশীয় মুদ্রা টাকার দাম কমতে শুরু করেছে। শেয়ার বাজার-এ শুরু হয়েছে ধস নামা। আমদানি খরচ বহুগুণ বেড়ে গেছে। গত কয়েক বছর ধরে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ ক্রমাগত কমে চলেছে। ২০১১-তে এই বিনিয়োগের প্রস্তাব গত ৫ বছরের মধ্যে নীচে চলে গেছে। আমাদের বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডারও ক্রমশ কমছে। ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক হিসাবে (সরকারি হিসাব) এর পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে ৩১১.৪৮ বিলিয়ন ডলারে। আর বি আই সস্তায় দেদার ডলার ছড়িয়ে অবস্থা সামাল দেওয়া শুরু করেছে। একদিকে টাকার দাম কমে যাওয়ায় রপ্তানীকারীরা ডলারে বিদেশী ঋণ (ECB)'র দিকে ঝুঁকেছে আর অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতি রুখতে ব্যাঙ্ক ঋণের উপর সুদ বেড়ে চলায় আমদানীকারীরাও ব্যবসা লাটে তুলে দেওয়ায় ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণ মুকুব করাও বেড়ে চলেছে। যেটুকু সংবাদ বেরিয়ে পড়েছে তাতে জানা যাচ্ছে ৩০.৯.১১ পর্যন্ত এই মকুব (restructured loans)-র পরিমাণ হলো ২৫০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে সর্ব ক্ষেত্রকে ভিখারি বানিয়ে সরকারের দৃষ্টি পড়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থানগুলোর প্রায় ২.১৫ লক্ষ কোটি টাকার মূলধনের দিকে। সরকার এই সংস্থাগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে তাদের প্রায় ১.৫০ লক্ষ কোটি টাকা নিজনিজ ক্ষেত্রের বাইরে রাস্তা ঘাট, রেল, জল, বিদ্যুতের মতো সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যয় করতে হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার অর্থে নির্বাচনী চমকের ব্যবস্থা পাকা করা হলো। অর্থনীতি লোপাট হোক, মুদ্রা ব্যবস্থা পঙ্গু হোক— এই কংগ্রেসীদের তাতে কিছুই এসে যায় না। শেয়ার বাজার ও মুদ্রা বাজারের অনিশ্চয়তা সরকারের জাতীয় অর্থনীতিকে ধ্বংস করার নীতিরই ফল।

উচ্চশিক্ষার নাগাল পাওয়া যাবে কীভাবে ?

অতিথি কলম

এম ভি কামাথ

ক'দিন আগে রাজধানীতে কয়েক শো ছাত্র করুণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। নতুন দিল্লির কোনও কলেজ তাদের ভর্তি করতে রাজি নয়। কারণ তাদের পাওয়া নম্বর অন্যদের তুলনায় কম। তাদের সহপাঠীরা স্কুলের শেষ পরীক্ষায় একশো শতাংশ নম্বর পেয়েছে। ৯০ শতাংশ নম্বরই যথেষ্ট মনে করা হচ্ছে না তথাকথিত অভিজাত কলেজে ভর্তির জন্য। অধিকাংশ 'অকৃতকার্য' ছাত্র মোটামুটিভাবে ঠিক করেছে হচ্ছে। আমেরিকার একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দি ট্রাইভ্যালি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয় ভারত থেকে আসা ছাত্ররা। জায়গাটা ওয়াশিংটন ডিসির খুব কাছে। সেখানকার ১,৫৫৫টি ছাত্রের মধ্যে ৯৫ শতাংশই ভারতীয়। সেই সংস্থার লোকঠকানো ব্যবসার ফাঁদে পড়ে ছাত্ররা রীতিমতো বিভ্রান্ত এবং হতাশ। সংস্থাগুলো বন্ধ হওয়ার মুখে। আর এর দরুন ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা সমস্যাচক্র থেকে বেরোবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। শুধু ছেলেমেয়েরা কি করবে? দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী কপিল সিবাল জানিয়েছেন, দেশে ৪৮০টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ২২ হাজার কলেজ আছে। ছাত্রছাত্রীদের চাহিদা মেটাতে দরকার ৮০০ বিশ্ববিদ্যালয় ও ৩৫ হাজার কলেজ। বিভিন্ন

ব্যাপক হারে বিদেশ যাত্রা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে তিনটে কাজ করলে। ১. আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠক্রম ও পঠন পদ্ধতিকে উন্নত করা দরকার। কথাটা বলা যত সহজ তা করা তেমন নয়। সেজন্যে দরকার সুপরিকল্পিত কর্মসূচি। ২. আমাদের হীনম্মন্যতা ছাড়তে হবে। অনেক ছাত্র বিদেশের নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চায় না, বিশেষ করে আমেরিকায়, তারা যায় তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাদের মূল উদ্দেশ্য আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পাওয়া।

বাইরে গিয়ে পড়াশোনা চালাবে। খরচ অনেক বেশি হলেও।

বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ভবিষ্যতের সিঁড়ি তৈরিতে শুধু ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকরা উদ্যোগী নন, দেশের সরকারও সেজন্যে বিদেশি মুদ্রা বরাদ্দ করতে রাজি। যে হিসেব মিলেছে, তাতে রয়েছে বছরে ১ লক্ষ ৬০ হাজার ছাত্র বিদেশ যাচ্ছে পড়তে। একাজে দেশের খরচ হচ্ছে ১০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ। লজ্জার ব্যাপার। আরও করুণ বৃত্তান্ত হলো, ভারতীয় ছাত্ররা আমেরিকার সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না। অনেক সময়েই ভর্তি হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষালয়ে।

হাজার হাজার ছাত্র ওইভাবে প্রতারিত আমেরিকা নয়, একই ছবি অন্যান্য উন্নত দেশেও। ২০১০ সালে ওইভাবে বন্ধ হয়েছে আটটি কলেজ। সেখানে ২,৩০০ ছাত্রের ভবিষ্যৎ অদৃশ্য সুতোয় ঝুলে আছে। এটা বড়ই নিষ্ঠুর এবং ব্যাপক প্রতারণার ব্যাপার।

প্রথম বলার কথা, কোনও একটা গলদ থাকছে স্কুলের শেষ পরীক্ষার ক্ষেত্রে। নম্বর দেওয়ার বেলাতেও। গত বছর স্কুল বোর্ডের পরীক্ষায় ১২ লক্ষ ছাত্রছাত্রী সফল হয়েছে। তাদের মধ্যে ৪১ হাজার ছেলেমেয়ে ৯০ শতাংশ কিংবা তার বেশি নম্বর পেয়েছে। বাকিদের অবস্থা কীরকম? এমনটা ঘটেছে মহারাষ্ট্রে। অন্যান্য রাজ্যের কথা ভাবুন। যদি ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর ভর্তি হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট না হয় তাহলে ৭৫ থেকে ৯০ শতাংশ নম্বর পাওয়া শাখাপ্রশাখায় শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ বাড়ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে দরকার হবে এক হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের। এ মুহূর্তে দেশে ছাত্র ভর্তির হার ১২.৪ শতাংশ। এর অর্থ স্পষ্ট, একশোজন ভর্তিযোগ্য ছাত্রের মধ্যে ১২.৪ শতাংশ ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে উচ্চ শিক্ষার জন্যে। বিশ্বের পটভূমিতে উচ্চশিক্ষার হার ২৩ শতাংশ। উন্নত দেশে ৪০ শতাংশ। অনুমান করা যেতে পারে, যে দেশ দ্রুত অগ্রগতির পথে এগোচ্ছে সেখানে কত নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আর কলেজ দরকার অর্থনৈতিক চাহিদা মেটানোর জন্যে! দাবি করা হয়েছে বিপুল পরিমাণ অর্থ ৭.৫ বিলিয়ন ডলার (টাকার হিসেবে ৩৪,৫০০ কোটি টাকা) বাঁচবে যদি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এদেশে শাখা খোলে। কিন্তু কেন তারা সে কাজ করবে?

গণমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, ভারত ও আমেরিকার শিক্ষা জগতের বিশিষ্ট মানুষ ও নীতিনির্ধারকদের বৈঠকের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি ওবামা আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। ১৩ অক্টোবর ওয়াশিংটন ডিসিতে সেই সম্মেলনে সদ্‌ভাবনা ও সহযোগিতার কথা বলা হয়। জানা যাচ্ছে, আমেরিকায় কিছু পাঠক্রম রয়েছে যা ভারতীয় ছাত্ররা উচ্চশিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু ভারতে এসে বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের সেরকম পাঠ নেওয়ার সুযোগ কম।

আসলে ২০০৮ সালে ১৫৬টি ফরেন এডুকেশন প্রোভাইডার সংস্থা কাজ করছে ৯০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে, ২০টি কলেজে ও ৪৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। আরও ২২৫টি সমঝোতা হয়েছে, ৬৬৫টি কর্মসূচি চলছে, ১৬৮ জন ম্যানেজমেন্ট ও বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ১৪৪ জন প্রযুক্তি ও কারিগরি বিদ্যার পাঠ নিচ্ছে, ১৩২ জন হোটেল প্রশাসনে। কিন্তু সংস্থাগুলো কোনও ডিগ্রি দেয় না। বিদেশি ছাত্রদের ডিগ্রি দেওয়া যায় যদি তা সরকারি অনুমোদন পায়। সেজন্যে ২০১০ সালের ৩ মে একটি বিল পেশ হয় সংসদে। তা অনুমোদিতও হয়। কিন্তু এখনও এদেশ থেকে ছাত্রছাত্রীদের বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার আকর্ষণ কমেনি। কারণ এদেশের ছাত্রছাত্রী ও তাদের বাবা মায়েরা বিদেশে উচ্চশিক্ষার ঘোরে থাকেন। বিদেশি ডিগ্রি থাকলে দর বাড়বে!

ওইভাবে ব্যাপক হারে বিদেশ যাত্রা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে তিনটে কাজ করলে। ১. আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠক্রম ও পঠন পদ্ধতিকে উন্নত করা দরকার। কথাটা বলা যত সহজ তা করা তেমন নয়। সেজন্যে দরকার সুপরিকল্পিত কর্মসূচি। ২. আমাদের হীনম্মন্যতা ছাড়তে হবে। অনেক ছাত্র বিদেশের নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চায় না, বিশেষ করে আমেরিকায়, তারা যায় তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাদের মূল উদ্দেশ্য আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পাওয়া।

বলা হয়েছে পশ্চিমের বিচারে বিশ্বের দরবারে ৪০০টি প্রথম শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় একটিও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নেই। কিন্তু কিসের ভিত্তিতে এমন কথা বলা হচ্ছে? ভারতের কোনও বিশ্ববিদ্যালয় কি বিদেশি ছাত্রদের পড়াশোনার উপযুক্ত নয়? স্বচ্ছন্দে বলা যায়, ভারতে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে যা বিশ্বের ২০০টি সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত হতে পারে। আমাদের শিক্ষাবিদ ও নীতি-নির্ধারকরা দূরদৃষ্টি নিয়ে এগোবেন—এটাই প্রত্যাশিত। শিক্ষক, ছাত্রদের বিদেশে পাঠাবার দরকার নেই পাঠক্রম ও শিক্ষণপদ্ধতি ইত্যাদি জানার জন্যে। আমরা আমাদের মান অনুযায়ী সব উন্নত করতে পারি। তাতে অবশ্যই বিপুল পরিমাণ অর্থ বাঁচবে। আমাদের দেশের কিছু বিশ্ববিদ্যালয় খুব খারাপভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এধরনের ভাবনা সেখানে কিছুটা পরিবর্তন আনতে পারে।

কেউ বিশ্বাস করতে পারেন অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ, ইয়েল, হারভার্ড প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় নিজের দেশেই শিক্ষকের অভাবে? তাদের সেরা শিক্ষকদের এদেশে পাঠাবে? আমরা একটা ব্যাপার জেনে রাখতে পারি, বিদেশে শিক্ষা নেওয়ার প্রবণতায় দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের মান নামছে বলে যা প্রচার করা হচ্ছে তা কিন্তু ঠিক নয়। বিশ্বের ৪৮ থেকে ৫২টি দেশের ছাত্রছাত্রী মণিপাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ নিয়েছে ২০০১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে। এটা একটা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বৈকি। এর মধ্যে থেকে একটা বার্তা মিলছে : ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্বচ্ছন্দে বিশ্বের যে কোনও সেরা মানের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। যেসব ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রযুক্তিবিদ বেরিয়েছে মণিপাল থেকে তারা নিজের দেশে ফিরে যোগ্যতা ও সম্মানের সঙ্গে কাজ করছে। তারা ফিরে গেছে স্বদেশের কর্মক্ষেত্রে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, এমনকী আমেরিকাতেও। আমরা সগর্বে বলতে পারি, ভারতীয়রাও কম যায় না আজকের শিক্ষাক্ষেত্রে। আমাদের নিজেদের উপর একটু বিশ্বাস থাকা দরকার, আমাদের যে ক্ষমতা আছে তাকে মূলধন করে আমরা বিশ্বমানে পৌঁছোতে পারি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে। সেই প্রত্যাশা করাটা কি খুব বেশি হয়ে যাবে?

(লেখক 'পদ্মভূষণ' সম্মানে ভূষিত বিশিষ্ট সাংবাদিক)

সৌজন্য : অর্গানাইজার, জানুয়ারি ১, ২০১২

নানা ইস্যুতে সরব মমতা কেন্দ্রের সর্বনাশা শিক্ষা নীতি নিয়ে নীরব কেন?

সাধন কুমার পাল

পাশফেল তুলে দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে গোল্লায় পাঠানোর পর অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত একই নীতি প্রবর্তিত হতে চলেছে, নীতিগতভাবে এমন একটি সিদ্ধান্ত বাম আমলে হয়েই ছিল। বহু প্রত্যাশিত রাজনৈতিক পালা পরিবর্তনের পর এরাজ্যের মানুষ ধরেই নিয়েছিল এবার বামেদের প্রবর্তিত বন্ধ্যা শিক্ষা নীতিতেও আসবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এরকম একটি আশা নিয়েই প্রত্যক্ষ ভাবে সক্রিয়তার সঙ্গে সেই পরিবর্তনের অংশীদার হতে অধ্যাপক সুনন্দ সান্যালের মতো পরিবর্তনপন্থী শিক্ষাবিদ সামিল হয়েছিলেন নতুন সরকারের গড়া শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটিতে। প্রথমে উচ্চশিক্ষা কমিটির চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরে যাওয়ার পর, চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশের আগেই স্কুলশিক্ষা পাঠক্রম কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে এই প্রবীণ শিক্ষাবিদের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নতুন সরকারের ভবিষ্যত শিক্ষা নীতি সম্পর্কে রাজ্যবাসীর মনে যে আবার সেই আশঙ্কা ও হতাশার জন্ম দিয়েছে এটা বুঝতে হবে।

মমতা ব্যানার্জী

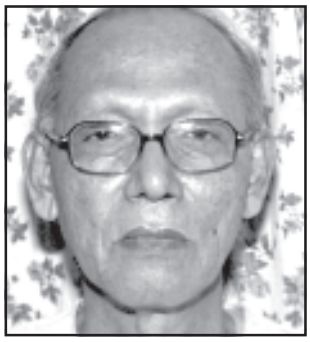

সুনন্দ সান্যাল

যদিও এই প্রবীণ শিক্ষাবিদ তাঁর পদত্যাগের কারণ হিসেবে শারীরিক অসুস্থতা ও ক্লান্তির কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু রাজ্য সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত বেশ কিছু সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতির সঙ্গে যে উনি কিছুতেই এক মত হতে পারছিলেন না মিডিয়ার দৌলতে সে খবরও প্রকাশ্যে এসেছে। যেমন, গত ১৪ নভেম্বর শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কাছে স্কুলশিক্ষা পাঠক্রম কমিটির অন্তর্বর্তী রিপোর্ট পেশ হয়েছে। যাতে কিনা বলা হয়েছে ২০১৩ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ধাপে ধাপে পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া হবে। অথচ গত ২৭ অক্টোবর রাজ্যমন্ত্রী সভার বৈঠকেই এই বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামতের অপেক্ষা না করে ২০১৩ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল ব্যবস্থা রদের সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল। সুনন্দ বাবুদের ক্ষমতাহীন করে রাখার ঘটনা এটাই প্রথম নয়। এর আগেও ব্রতচারী ও ফিজিক্যাল এডুকেশনকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা এবং স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে লটারি প্রথাকে রেখে দেওয়ার ঘোষণাও স্কুল পাঠক্রম কমিটিকে অন্ধকারে রেখেই করা হয়েছিল। তাছাড়া অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের সঙ্গেও উনি একমত হতে পারছিলেন না। ফলে নজিরবিহীনভাবে কমিটি-প্রধান অধ্যাপক সান্যাল নিজে এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে অসহমত ব্যক্ত করে কমিটির অন্তর্বর্তী রিপোর্টে 'নোট অফ ডিসেন্ট' দিয়েছেন। কারণ তিনি মনে করেন অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দিলে এর ধাক্কা স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে উচ্চশিক্ষাতেও লাগবে। এক্ষেত্রে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এই নো-ডিটেনশন পলিসির বিরুদ্ধে এই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের বিরোধিতা ওঁর ব্যক্তিগত মতামত ভাবলে চলবে না। কারণ এর আগে পাশ-ফেল তুলে দেওয়া নিয়ে জনমত যাচাই এর জন্য পাঠক্রম কমিটির উদ্যোগে যতগুলি আলোচনা সভা হয়েছে তাতে অধিকাংশ শিক্ষক-সংগঠনই এই ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে মত দিয়েছে। শিক্ষক সংগঠনগুলির বক্তব্যে উঠে এসেছে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সমস্ত স্তরের মানুষের নো-ডিটেনশন পলিসির বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তির কথা। এই সমস্ত আলোচনা সভার অনেকগুলিতে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু নিজেও উপস্থিত ছিলেন। এই সমস্ত আলোচনা সভায় উঠে আসা মতামতের নির্যাস সুনন্দবাবুর কথাতেই পাওয়া যাবে যাতে কিনা উনি বলেছেন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল ব্যবস্থা তুলে দিলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে অতি দুর্বল পড়ুয়ারা যারা পরবর্তী উঁচু শ্রেণীতে প্রমোশন পাবে আখেরে তাদেরও বিরাট ক্ষতি হবে।

শোনা যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রী নিজেও নাকি ব্যক্তিগতভাবে স্কুল স্তরে পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার বিরোধী। এব্যাপারে স্কুল স্তরে পাশ-ফেল না রাখার কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য কেন্দ্রের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী কপিল সিবালকে একটি চিঠিও পাঠিয়েছেন। সংবাদ মাধ্যমের লোকেরাও শিক্ষামন্ত্রীর সামনে এই প্রশ্নটিই রেখেছিলেন যে রাজ্যের মানুষ চাইছে না যে স্কুল শিক্ষায় পাশ-ফেল উঠে যাক তা সত্ত্বেও জনমতের বিরুদ্ধে গিয়ে সরকার কেন এরকম একটি সিদ্ধান্ত নিতে গেল? এর উত্তরে ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় আইন অনুসারে এটি করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের পদস্থ আমলাদের অনেকেই এমনটাই মনে করেন যে সংবিধানে শিক্ষা যৌথতালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য রাজ্যসরকার পাশ-ফেল রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে পরবর্তী সময়ে পিটিটিআই সমস্যার মতো নানা রকম জটিলতা তৈরি হতে পারে। তাছাড়া শিক্ষার অধিকার আইন যেহেতু সংসদে পাশ হয়েছে সেজন্য রাজ্যের পক্ষে এটিকে পাশ কাটানোও মুস্কিল। সন্দেহ নেই যে এই সমস্ত যুক্তিতেও যথেষ্ট সারবত্তা আছে।

এই সমস্ত যুক্তির পাল্টা শক্তিশালী যুক্তি যেমন আছে তেমনি এই সমস্ত যুক্তি মাথায় রেখেও পরিবর্তনের সরকারের কাছে প্রত্যাশাজাত অনেক প্রশ্নই মানুষের মনে উঠেছে। যেমন, ১) প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ, শ্রেণীকক্ষ ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক পরিকাঠামো নির্মাণে উদ্যোগী না হয়ে বামেদের মতো কেন্দ্রীয় আইনের দোহাই দিয়ে নতুন সরকার অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়া নিয়ে উদ্যোগী হয়ে উঠল কেন? শিক্ষার অধিকার নামক যে আইনের অজুহাতে সরকার পাশ-ফেল রদ করতে চাইছে সেই একই আইনে এক বিজ্ঞানসম্মত পরিকাঠামো নির্মাণের

কথাও বলা হয়েছে।

যেমন বলা হয়েছে ছাত্র শিক্ষক অনুপাত প্রাথমিকে হবে ৪০ : ১ এবং পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পযন্ত হবে ৩৫ : ১, প্রতিটি স্কুলে থাকবে মুক্ত প্রবেশ পথ, পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানীয় জল, মিডডে মিল, খেলার মাঠ, বিদ্যালয় প্রাচীর, ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক শৌচাগার, সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের ব্যবস্থা সহ লাইব্রেরি, খেলার উপকরণ ও ব্যবস্থার মতো নানা আধুনিক সুযোগ সুবিধা। আর্থিক সংকট বা সদিচ্ছার অভাব যে কারণেই হোক এই ধরনের পরিকাঠামো নির্মাণ যে সরকারি উদ্যোগে সম্ভব নয় এটা বুঝতে পণ্ডিত হওয়ার দরকার নেই। পরিকাঠামো প্রশ্নে সরকারি অক্ষমতা নিয়ে মানুষ এতটাই নিশ্চিত যে এই নিয়ে কোনও আলোচনা, সমালোচনা বা শিক্ষার অধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার আইনি ভয় কেউ পাচ্ছে বলে সচরাচর শোনা যায় না। তবে পরিকাঠামো নিয়ে তেমন একটা উচ্চবাচ্য না হলে কি হবে পাশ-ফেল রদ নিয়ে সরকার এতটাই তৎপর যে অজ্ঞ-বিজ্ঞ সবার চোখের সামনে 'শিক্ষার অধিকার মানে পাশ-ফেল রদ!' এরকম একটি সমীকরণ স্বাভাবিক বলে মনে হতে শুরু করেছে। সস্তায় 'শিক্ষার অধিকার' পাইয়ে দেওয়ার ঐতিহাসিক কৃতিত্বের অধিকারী হওয়ার লোভ থেকেই যে এদেশে শিক্ষা নিয়ে সর্বনেশে অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ হচ্ছে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। দেশের অন্যত্র যাই হোক না কেন এ রাজ্যের 'পরিবর্তনের সরকার'ও যে আগের বাম সরকারের মতো শিক্ষা নিয়ে মানুষের ভাবনার উল্টো দিকে হাঁটবে এটা কিন্তু মানুষ এখনও বিশ্বাস করতে চাইছে না। ২) দেখা গেছে শূন্য পেয়ে বা কম নম্বর পেয়ে পরবর্তী উচ্চশ্রেণিতে উঠে পড়ুয়ারা সেই শ্রেণীর সঙ্গে তাল মেলাতে পারে না। তাল মেলাতে না পারা সংক্রান্ত এই সমস্যার জন্য দুর্বল পড়ুয়াদের অনেকেই পড়া ছেড়ে দেয়। বিগত বামফ্রন্ট সরকার প্রাথমিকে পাশ-ফেল তুলে দিয়েও যে সমস্ত কারণে ড্রপ আউট কমাতে পারেনি এটি তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। পরিসংখ্যান বলছে প্রাথমিকে যা ভর্তি হয় দ্বিতীয় শ্রেণিতে তার অর্ধেক পড়া ছেড়ে দেয়। চতুর্থ শ্রেণিতে সেই ড্রপআউট গিয়ে দাঁড়ায় ৫৮ শতাংশে। মোট কথা, যাদের জন্য এত আয়োজন পাশ-ফেল তুলে দিয়ে সেই পিছিয়ে পড়াদেরও স্কুলে ধরে রাখা যাচ্ছে না। পাশ-ফেল না থাকাটাও যে শিক্ষার অধিকার অর্জনের পথে অন্যতম বাধা হতে পারে শিক্ষার অধিকার আইনে এই বিষয়টি ভাবা হয়নি।

অথচ সবাইকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখার জন্য পড়াটাকে চাপমুক্ত করতে গিয়ে শিক্ষার মানের সঙ্গে সীমাহীন বোঝাপড়া করতে হয়েছে। ২০১০-এ দিল্লী থেকে প্রকাশিত একটি বার্ষিক রিপোর্ট বলছে এই রাজ্যের দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়াদের ৬৩ শতাংশেরও বেশি ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা চিনতে পারে না। পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়াদের ৬৭ শতাংশ প্রথম শ্রেণির পাঠ্য পুস্তক পড়তে পারে না, ৫৪ শতাংশ দ্বিতীয় শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তক পড়তে পারে না, ৬৫ শতাংশ সহজ বিয়োগ ও ৬৪.৫ শতাংশ সরল ভাগ করতে পারে না। অষ্টম শ্রেণির ৭৫ শতাংশেরও বেশি পড়ুয়া সরল ইংরেজি বাক্য পড়তে পারে না। স্বাভাবিক ভাবেই নিম্নমানের চাপমুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় ড্রপআউটদের সঙ্গে সঙ্গে সামর্থ্যবানরাও সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা ছেড়ে পালাচ্ছে। এর বড় প্রমাণ পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার পর বিগত দুই দশকে এ রাজ্যে প্রায় আড়াই হাজারের মতো প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাত্রাভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি গড়ে উঠছে হাজার হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

ভালো পরিকাঠামো আর চাপমুক্ত হলেই যে শিক্ষার গুণগতমান ভালো হয় না এরকম দৃষ্টান্ত দেশের বাইরেও আছে। ভারতের তুলনায় নগণ্য জনসংখ্যা সম্পন্ন ইউরোপ-আমেরিকার যে সমস্ত দেশের অনুকরণে এই দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের ভাবনা চিন্তা হচ্ছে সে সব দেশে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত কোথাও ১০ : ১ আবার কোথাও বা ২০ : ১। শুধু মাত্র এই একটি তথ্যই বোধহয় ওই সমস্ত দেশের উন্নতমানের শিক্ষা পরিকাঠামো সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। এত সবের পরেও আমেরিকার মতো দেশের বেসিক এডুকেশন যে ভালো নয় ওয়াকিবহাল মহল মাত্রেই একথা জানে। শিক্ষাক্ষেত্রে ভারত ও চীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমেরিকানদের পেরে উঠতে না পারার এটি অবশ্যই একটি কারণ। আমেরিকান স্টাইলের চাপমুক্ত স্কুলশিক্ষা এদেশেও একবার চালু হলে ওদের আর ভারতীয়দের তুলনায় পিছিয়ে থাকতে হবে না ভেবেই হয়তো এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার বড় প্রবক্তা কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী কপিল সিবালকে আমেরিকা ইতিমধ্যেই একটি বড় মাপের পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছে।

শিক্ষাবিদ সুনন্দ সান্যালও বলেছেন বড়জোর তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পাশ- ফেল রদ করা যেতে পারে, এর পরেই এই নীতি পড়ুয়াদের জন্য হানিকর হবে। ভারতের নিজস্ব শিক্ষা দর্শনেও সেরকম কথাই বলা আছে। 'লালয়েত পঞ্চবর্ষানি, দশবর্ষানি তাড়য়েৎ। প্রাপ্তে তু ষোড়শেবর্ষে পুত্রং মিত্রবৎ আচরেৎ।' এই শ্লোকটিতে স্পষ্টই বলা আছে পাঁচ বছর পর্যন্ত স্নেহ ও ষোল বছর বয়স থেকে বন্ধুর মতো আচরণ করলেও এর মাঝের সময়টুকু পড়ুয়াদের চাপেই রাখতেই হবে। পাশ-ফেল ছাড়াও অন্য কোনও উপায়েও এটা হতে পারে। যেমন ধরুন নো-ডিটেনশন পলিসি বজায় রেখেও এমন একটা নিয়ম করা যেতে পারে যে পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণিতে উত্তরণের সময় পড়ুয়াদের মান অনুসারে গ্রেডেশন করে রাখা হলো। নবম শ্রেণিতে ভর্তির শর্ত হিসেবে প্রত্যেক শ্রেণিতে ন্যূনতম একটি গ্রেড (যেমন গ্রেড এ অথবা বি) পেতে হবে এমন নিয়ম করে রাখা হলো। এতে পড়ুয়াদের মধ্যে ভাল করার চাপ থাকবে, মেধার স্বীকৃতিও আসবে, আবার 'শিক্ষার অধিকার'ও বজায় থাকবে। মোট কথা, ভালো কিছু করা বা লক্ষ্যে পৌছানোর চাপ পড়ুয়াদের মধ্যে থাকতেই হবে। কারণ কোনও চাপ না থাকলে বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ বড়রাই কাজ করে না কোমলমতি পড়ুয়ারা করবে কেন?

তিস্তা চুক্তি, পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি ও খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ নিয়ে কেন্দ্রের জনবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা যেভাবে রুখে দাঁড়ালেন এবং এরাজ্যের জয়েন্ট-প্রত্যাশীদের জন্য দেশ জোড়া অভিন্ন জয়েন্টে বাংলা মাধ্যম রাখার জন্য যে ভাবে চেষ্টা চালালেন তাতে কিন্তু এরাজ্যের মানুষ আন্তরিক ভাবেই তার পাশে থেকেছে। কারণ দীর্ঘ বাম শাসনে পিছিয়ে পড়ে মানুষ এমন একজনকে এই বাংলার মসনদে চেয়েছিলেন যিনি কিনা মানুষের স্বার্থে আপোসহীন হয়ে লড়াই করবেন। এই চাওয়া থেকেই এরাজ্যের মানুষ প্রত্যাশা করে ছিল যে শিক্ষায় এরাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন সরকার কেন্দ্রের এই সর্বনাশা শিক্ষানীতির তীব্র বিরোধিতা করে এক শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন গড়ে তুলবে। 'শিক্ষার অধিকার' নামক দায়বদ্ধতার মোড়কে সরকারি শিক্ষার বারোটা বাজিয়ে পুরো স্কুল শিক্ষাটিকেই ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়ার মতো কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাকে রুখে দেওয়ার মতো দৃঢ়তা দেখাবে। সেক্ষেত্রে সর্বশক্তি দিয়েই মানুষ সরকারের পাশে দাঁড়াত। এরকম একটি পরিস্থিতিতে নতুন সরকারের পাশ-ফেল রদের ঘোষণায় মানুষের প্রত্যাশা যে উদ্বেগ ও হতাশায় পরিণত হয়েছে এবিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে মানুষ এখনও বিশ্বাস করে রাজ্য সরকার শেষ পর্যন্ত পাশ-ফেল নিয়ে বর্তমান ঘোষণা প্রত্যাহার করে শিক্ষায় এরাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা কিছু সাহসী বিকল্পের কথা ভাববেই।

তেষট্টি বছরে শিক্ষার হাল কোথায় পৌঁছেছে?

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

চলতি বছরের এপ্রিল মাস পড়লেই শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারের আওতায় আনা বহু আলোচিত 'রাইট টু এডুকেশন বিল ২০১০'-এর ২ বছর পূর্ণ হবে। আমাদের মতো দরিদ্র দেশে এমন একটি পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় ছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী ৬৩ বছরের দীর্ঘ সময়পর্বে, ৬ থেকে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা পাওয়ার অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দীর্ঘ প্রতীক্ষিত। এটি কোনও দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শন বা মহানুভবতার প্রকাশ কখনই নয়। তবে এই নবতম মৌলিক অধিকারটির সুফল ছেলেমেয়েরা কতটা গ্রহণ করতে পেরেছে সেই সংক্রান্ত অ্যানুয়াল 'স্ট্যাটাস অফ এডুকেশন রিপোর্ট ২০১১' (ASER 2011) কিছু হতাশাব্যঞ্জক তথ্য প্রকাশ করেছে।

'প্রথম' নামের একটি শিক্ষা বিষয়ক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তাদের অনুসন্ধানের ভিত্তিতে ২০১০ সালের তুলনায় ২০১১ সালে পড়ুয়াদের শিক্ষিত হয়ে ওঠার মান যে খারাপ হয়ে যাচ্ছে সেই দিকেই ইঙ্গিত করেছে। গ্রামীণ অঞ্চলগুলিতে বুনিয়াদী পাটীগণিত ও পড়তে পারার ক্ষমতা অর্জন করার ক্ষেত্রে সরকারি ও প্রাইভেট স্কুল মিলিয়ে শতকরা হার নেমে গেছে। সহজ কথায় তারা ২০১০ সালে যে হারে শিক্ষিত হয়ে উঠছিল এক বছরে সেই হার কাঙ্ক্ষিত বৃদ্ধির থেকে কমে গেল।

সাত বছর আগে চালু হওয়া আলোচ্য সংস্থাটির সরকারি মহলেও যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা থাকায় তাদের দেওয়া তথ্যগুলির ওপর আস্থা রাখা যেতে পারে। এই সমীক্ষা মোতাবেক সরকারি স্কুলগুলির তুলনায় প্রাইভেট স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের মান কিছুটা ভাল। এর ফলেই অভিভাবকরা একটু সামর্থ্য থাকলেই সন্তানদের প্রাইভেট স্কুলগুলিতে পাঠাচ্ছেন। সরকারি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর পড়ুয়ার শতকরা ৫৬ জন যেখানে তৃতীয় শ্রেণীর বই-পত্তর পড়তে পারছে না, প্রাইভেট স্কুল পড়ুয়াদের হার সেখানে শতকরা ৩৮ জন। শহরাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে এই প্রবণতা দীর্ঘদিন আগে দেখা গেলেও এই সমীক্ষা অনুযায়ী সরকারি স্কুলের প্রতি অনীহা এখন গ্রামাঞ্চলেও ব্যাপক আকার নিয়েছে।

দেশে ১৩ লক্ষ সরকারি প্রাথমিক স্কুল থাকলেও মোট ১ লক্ষ ৮২ হাজার প্রাইভেট স্কুলেই ভর্তি হওয়ার তাগিদ দৃষ্টিকটু ভাবে বেশি। এটি যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়। কেননা অভিভাবকরা স্বাভাবিকভাবেই চাইবেন সন্তানরা সঠিকভাবে শিক্ষা পাক। ২০০৬ সালে যেখানে উল্লেখিত বয়সের পড়ুয়াদের প্রাইভেট স্কুলে ভর্তির হার ছিল ১৮.৭ শতাংশ, তা ২০১১-য় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৫.৬ শতাংশ।

হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, পাঞ্জাব, রাজস্থান, জম্মু-কাশ্মীর, উত্তরাখণ্ড, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশের মতো রাজ্যে স্কুলগুলি কেউ প্রত্যন্ত অঞ্চলে কেউ বা একেবারে ঝাঁ চকচকে শহরঞ্চলের বাসিন্দা হলেও শিক্ষার্থীদের ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ এখন প্রাইভেট স্কুলগুলিতেই পড়াশোনা করছে। আবার দেশের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি আলোচিত মানদণ্ডে একান্ত নেতিবাচক ফলাফল করায় পড়ুয়ারা প্রাইভেট টিউশনের শরণাপন্ন হচ্ছে। এ আমরা বহুদিন ধরেই চাক্ষুষ করছি। কিন্তু এরপরও পূর্বাঞ্চলের শিক্ষাগত মানের অধোগমন ঠেকানো যায়নি। পশ্চিমবঙ্গেই পঞ্চম শ্রেণীর পড়ুয়াদের শুধুমাত্র সামান্য অঙ্কের ভাগ করার দক্ষতা অর্জনের হার ২০১০ সালের ৩৭.৭ শতাংশ থেকে ২০১১-য় ৩১.৪-এ নেমে এসেছে। সর্বভারতীয় প্রেক্ষিতে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রের দ্বিতীয় শ্রেণীর বই পড়তে পারার ক্ষমতার হার ২০১০ সালের ৫৩.৭ শতাংশ থেকে ৪৮.২

বিদ্যের দৌড়-১

পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র যাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর স্তরের পাঠ্যসূচি পড়তে সক্ষম (শতাংশের হিসেবে)

সাল	সারা ভারত*	পশ্চিমবঙ্গে
২০১০	৫৩.৭	৫৩.৯
২০১১	৪৮.২	৪৮.৪

** গুজরাট, পাঞ্জাব ও তামিলনাড়ুতে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে।*

বিদ্যের দৌড়-২

	সারা ভারত*	পশ্চিমবঙ্গে
১ থেকে ৯ অবধি সংখ্যা চিনতে অক্ষম তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র-সংখ্যা (শতাংশের হিসেবে)	৭.৫	৪.১
১ থেকে ৯ অবধি চেনে কিন্তু তার পরবর্তী সংখ্যা চিনতে অক্ষম তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা (শতাংশের হিসেবে)	২৬.৯	২২

** অন্ধ্র, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতে উন্নতি চোখে পড়ছে।*

শতাংশে নেমে এসেছে। বিশেষভাবে উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রেই এই পতন প্রকট। তুলনায় গুজরাট, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাবের কিছুটা উন্নতি হয়েছে। সর্বভারতীয় পর্যালোচনা অনুযায়ী তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের ২ দিয়ে সংখ্যা ভাগ করতে পারার ক্ষমতা ২০১০-এর ৩৬.৩ শতাংশ থেকে ২৯.৯ শতাংশে তলিয়ে গেছে। আবার পঞ্চম শ্রেণীর ক্ষেত্রে ওই একই মানদণ্ড ভয়াবহভাবে ২০১০-এর ৭০.৯ থেকে ৬১ শতাংশে অবস্থান করছে। পরিসংখ্যানগুলি রাইট টু এডুকেশনের বাস্তব সাফল্যকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়।

প্রধানমন্ত্রী প্রায়শই ২০১১ সালের (২০০৭-১২) একাদশ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাটিকে 'শিক্ষার পরিকল্পনা' বলে গর্ব করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে আরও জানান, একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দশম পরিকল্পনার ৭.৭ শতাংশ থেকে এক লাফে দ্বিগুণেরও বেশি বাড়িয়ে ১৯ শতাংশ (২ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা) করা হয়েছে। অর্থ বরাদ্দের এই বিপুল বৃদ্ধির পাশাপাশি হাতে কলমে 'শিশু ভারতের' শিক্ষার গুণগত উন্নতি কিন্তু আশার উদ্রেক করে না।

আলোচিত 'প্রথম' সংস্থার প্রেসিডেন্ট মাধব চৌহান আশঙ্কা ব্যক্ত করে বলেছেন "প্রাথমিক শিক্ষার এই ক্রমিক অবনমন দেশে জনসংখ্যার এক গরিষ্ঠাংশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। দেশের তুলনায় অনুন্নত উত্তরাঞ্চলের দিকে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করতেই হবে।" এর পরেই তিনি অত্যন্ত আবশ্যিক প্রশ্নটি তুলেছেন। তাঁর আশঙ্কা এই ধরনের শিক্ষালাভ করে পড়ুয়ারা ব্যবহারিক জীবনে কী চাকরি জোগাড় করতে পারবে? এদের মধ্যে থেকে শিল্পজগৎ কি যোগ্যতাসম্পন্ন পেশাদার (Professional) কর্মীদের প্রয়োজন মেটাতে পারবে? যদি না পারে তবে ভারতের 'বৃদ্ধির গল্প' (Growth Story) কতদিন টিকবে? এই প্রসঙ্গে আজকাল ক্যাম্পাস নিযুক্তির খুব চল হয়েছে। এখানে প্রশ্ন রয়েছে যদি প্রথম সারির ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি থেকে ও অন্যান্য প্রাইভেট কলেজের বেশ ভাল ফল করা ছেলেরাই আগেভাগে নিযুক্ত হয়, তাহলে বাকি ছেলেদের ভবিষ্যৎ কি হবে তা নিয়ে পৃথক

প্রাইভেট টিউশনির রমরমা

সরকার পরিচালিত স্কুল সমূহে কত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী প্রাইভেট টিউশন নিতে বাধ্য হচ্ছেন

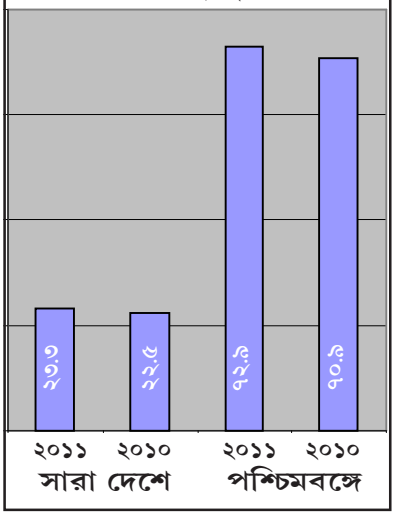

পরিসংখ্যানগুলি গ্রামীণ এলাকায়, কিন্তু সরকারি বেসরকারি উভয় স্কুলে করা।
সৌজন্যে : টাইমস অফ ইন্ডিয়া

সমীক্ষা করার সময় এসেছে। একটু বিষয়ান্তরে গিয়ে বলা যায়— বিগত কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে প্রফেশানাল (ইঞ্জিনিয়ার, কারিগরি বিশারদ) তৈরির জয়েন্ট প্রবেশিকা পরীক্ষার মান ক্রমশ নামিয়ে আনা হচ্ছে। দশ বছর আগেও পরীক্ষায় সফল ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনামূলকভাবে যে কঠিন প্রশ্নাবলীর মোকাবিলা করতে হোত আজ তা অনেক নমনীয় হয়েছে। এ সত্ত্বেও ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বাছাই কিছু বিভাগ ছাড়া অনেক বিভাগেই ফাঁকা যাচ্ছে। একেবারে ওপরের দিকে থাকা পরীক্ষার্থীরাই মনমতো 'স্ট্রিম' পাচ্ছে। একটু নজর করলেই দেখা যাবে ভর্তির কাউনসেলিং-এর প্রথম ডাক পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আগের চেয়ে তিনগুণ হয়ে গেছে। এর পরও সিট খালি থাকছে। ফলশ্রুতিতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে রাজ্যে রাজ্যে নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খোলা ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেছে। কিছু কিছু রাজ্যে তা বন্ধও হয়েছে। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে সফল হওয়া পড়ুয়াদের গরিষ্ঠাংশ প্রাইভেট টিউশন নিয়েই কৃতকার্য হয়েছে।

শুরুর সেই পরিসংখ্যানগুলির সারবত্তাই প্রমাণিত হচ্ছে। শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষা পড়ুয়াদের নির্ধারিত মানে নিয়ে যেতে পারছে না। দেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রিপোর্টটি প্রকাশ করেছেন। তিনি অবশ্য শিক্ষার দুরবস্থা নিয়ে কোনও বিশেষ পথনির্দেশ দেওয়ার রাস্তায় হাঁটেননি। পক্ষান্তরে রাজনীতিকের ভাষায় জানিয়েছেন 'রাইট টু এডুকেশনের' হাতে- কলমে প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যের দায়িত্বই বেশি। অবাক করার বিষয় 'প্রথম' নামের নিয়োজিত সংস্থাটি শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারকে শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ বা মান নির্ধারণ করার দায়িত্ব দিলেও মন্ত্রী সে ব্যাপারে উচ্চবাচ্য না করে ভাল ফলাফলের জন্য ৫ থেকে ৭ বছর ধৈর্য ধরার নিদান দিয়েছেন।

শিক্ষার অধিকার

কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার অধিকার আইন প্রণয়ন করিয়াছে। সারা দেশেই চলতি বছর হইতে এই আইন কার্যকর করা হইয়াছে। কিন্তু এই আইন কি উপায়ে প্রযুক্ত হইবে তাহা লইয়া রাজ্য সরকার সমূহের মধ্যে এখনও যথেষ্ট বিভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। অন্য অনেক রাজ্য নিজেদের মতো করিয়া বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়া সমস্যা সমাধানের উপায় করিয়া লইলেও ত্রিপুরার ক্ষেত্রে তেমন কোনও উদ্যোগ আগে হইতে লওয়া হয় নাই। ফলে এখানে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে যে এই রাজ্যে অনেক মেধাবী ছাত্রের কাছে এই আইন শিক্ষার অধিকার রক্ষা নহে, অধিকার হরণের অস্ত্র হইয়া উঠিতেছে। এখন পর্যন্ত যাহা পরিস্থিতি তাহাতে অনেক মেধাবী ছাত্র তাহার পছন্দমতো স্কুলে ভর্তির সুযোগ পাইবে কি না তাহাই সংশয়ের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

সমস্যার মূলে রহিয়াছে নতুন শিক্ষার অধিকার আইনের একটি ধারা যেখানে সংশ্লিষ্ট স্কুল হইতে নির্দিষ্ট দূরত্বে বসবাসকারী ছাত্রছাত্রীদের সংশ্লিষ্ট স্কুলে ভর্তির অধিকার নিশ্চিত করা হইয়াছে। এতদিন বাড়ির কাছে স্কুল থাকিলেও অনেক ছাত্র সেখানে ভর্তির সুযোগ পাইত না। তাহাতে অনেক দূরে যাইতে হইত। কচিকাঁচা তো বটেই অভিভাবকদের কাছেও তাহা এক বাড়তি বোঝা হইয়া উঠিত। এই অসুবিধার কারণে অনেক ছেলেমেয়েকে অসময়ে পড়াশুনার পাট চুকাইয়াও দিতে হইত। এহেন এক দুঃসহ পরিস্থিতি হইতে ছাত্রছাত্রীদের নিস্তার দিতেই নতুন এই শিক্ষার অধিকার আইন প্রণয়ন করা হইয়াছিল।

রাইট টু এডুকেশন আইনের প্রণয়নের পেছনে যে একটি মহৎ উদ্দেশ্য কাজ করিয়াছে তাহাতে কোনও রকম সন্দেহ থাকিতে পারে না। ছাত্রছাত্রীদের বাড়ির কাছাকাছি স্কুলে পঠন পাঠনের সুযোগ করিয়া দেওয়া অবশ্যই যে কোনও জনকল্যাণকামী সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু এই আইন প্রণয়নের সময় বাস্তব কিছু সমস্যার কথা যথাযথভাবে বিবেচনায় আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যেমন উৎকর্ষের কেন্দ্র হইতে পারে এমন বেশীর ভাগ স্কুলই অবস্থিত শহরাঞ্চলে। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা শহরের কথাই এই ক্ষেত্রে ধরা যাইতে পারে। যে কয়েকটি ভাল ভাল স্কুল রহিয়াছে তাহার সবকটিই এই শহরের কয়েক কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে অবস্থিত। বিশেষ করিয়া ইংরাজি মাধ্যমের বেশীরভাগ স্কুলই অবস্থিত শহরের কেন্দ্রে। শহর শহরতলী বা একটু দূরে যাহাদের বাড়ি তাহারাও এইসব স্কুলে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। বিগত কয়েকদিন ধরিয়া অভিভাবকরা ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়া গেলেও এখন পর্যন্ত সমস্যা সমাধানের কোনও বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে না।

শিক্ষার অধিকার আইনে অবশ্য সমস্যা সমাধানের জন্য একটি সংস্থান রাখা হইয়াছে। তাহা হইলে উৎকর্ষের কেন্দ্র বলিয়া কিছু স্কুলকে চিহ্নিত করিয়া সেগুলিকে এই এলাকাভিত্তিক বাধ্যবাধকতা হইতে মুক্ত করা যাইতে পারে। ঝাড়খন্ড সরকার ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা লইয়াছে। মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত লইয়া বেশ কিছু স্কুলকে এই এলাকাভিত্তিক বাধ্যবাধকতা হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। ইতিমধ্যেই সে সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তিও জারী করা হইয়াছে। সম্প্রতি কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দল রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এই ব্যাপারে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ছাত্রছাত্রীদের বাস্তবসম্মত সমস্যার কথা বিবেচনা করিয়া এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সময়ানুগ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি বলিয়া মনে হইতেছে। এখন স্কুলে স্কুলে ভর্তির মরশুম চলিতেছে। তাই যাহা করিবার তাহা এখনই করিতে হইবে। অযথা কালক্ষেপ করিলে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের পক্ষে তাহা মারাত্মক হইতে পারে।

শিক্ষার বিষয়টি অতীব স্পর্শকাতর। সব মা-বাবাই চান তাহাদের সন্তান একটি ভাল স্কুলে ভর্তি হোক। কিন্তু কেবলমাত্র বাসস্থান দূরে বলিয়া যদি তাহাদের সন্তান এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয় তবে এর চাইতে দুর্ভাগ্যের আর কিছুই হইতে পারে না। ইতিমধ্যেই অভিভাবকদের একটি বড় অংশ ছেলেমেয়েদের ভাল শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে বে-সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে ধাবিত হইতে শুরু করিয়াছেন। কিন্তু এইসব স্কুলে পঠন-পাঠনের ব্যয় বহন করিবার মতো সামর্থ্য অনেক অভিভাবকেরই নাই। এই কারণে যদি সন্তান ভাল শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয় তবে তাহা শুধু দুর্ভাগ্যজনকই নহে জাতির পক্ষে বিরাট ক্ষতিও বটে। তাই ছাত্রছাত্রীদের চাহিদার কথা বিবেচনা করিয়া প্রয়োজন হইলে আইনকে সময়ানুগভাবে সংশোধনের কথাও ভাবিতে হইবে। যাহাদের জন্য আইন তাহারাই যদি তাহার সুফল ভোগ করিতে না পারে তবে সেই আইন অর্থহীন হইয়া পড়িবে। মনে রাখিতে হইবে শিক্ষা মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। এই অধিকার হইতে তাহাকে কেউ বঞ্চিত করিতে পারে না।

এইপ্রসঙ্গে বে-সরকারি স্কুলে পঠন- পাঠনের ক্ষেত্রে ব্যয়ের বিষয়টি লইয়াও ভাবনা- চিন্তার প্রয়োজন রহিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। এটা ঠিক যে সরকারের পক্ষে শিক্ষার সব দায়িত্ব গ্রহণ সম্ভব নহে। সে কারণেই সরকার এক সময় শিক্ষার ক্ষেত্রে বে-সরকারি উদ্যোগকে উৎসাহ দিয়াছে। কিন্তু তাহাদের একটি অংশ শিক্ষাকে যেভাবে বাণিজ্যের উপকরণ বানাইয়াছে তাহা কিন্তু কোনও অবস্থাতেই মানিয়া লওয়া যায় না। তাই এইসব বে-সরকারি স্কুলকে নিয়ন্ত্রণে রাখিতে কি করা যায় তাহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

(সৌজন্যে : দৈনিক সংবাদ)

অন্য রকম

মাটির সুরে : নদীয়ার গোরভাঙ্গায় বাউল-ফকিরের দল।

গেঁয়ো সুর ভেসে বেড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা সেই কিংবদন্তী-র নাম যার রূপ প্রত্যক্ষ করছে গোটা নদীয়া জেলা, বাদ্যযন্ত্র দোতারা-ভূমি হিসেবে যার সাঙ্গীতিক পরিচিতি। বর্তমান রাজনৈতিক, কূটনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে এর অপরিসীম মূল্য নিরূপণ একপ্রকার অসাধ্য-সাধনের পর্যায়েই পড়বে। নদীয়া জেলার ছোট্ট একটা গ্রামের নাম গোরভাঙ্গা। বিশেষ পরিচিতি নেই বটে, তবে প্রত্যেক গ্রামবাসী সঙ্গীতের চর্চা করেন— এমন একটা জনশ্রুতি প্রবল। এহেন জনশ্রুতি খুব একটা অমূলক নয়। গ্রামের কৃষকের থেকে শুরু করে মুদীখানার দোকানের ছেলেমেয়েরা মেঠো পথে খেলতে খেলতে গান গায়। তাদের সুরে একটা অন্যরকম মাদকতা আছে। সুরের সেই গেঁয়ো গন্ধটা খুব মিঠে আর মনকাড়া। ঠিক ধরেছেন, গ্রাম-বাংলার সনাতনী সঙ্গীতের অনন্য ঐতিহ্যেরই পরিচায়ক সেটি। স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের সুরে যার ওপর অনেকটা ভরসা করেছিলেন এ সেই বাউলগান।

আর এখানেই নিহিত বর্তমান রাজনৈতিক তথা সামাজিক প্রেক্ষাপট। নদীয়া থেকে মালদা কিংবা মুর্শিদাবাদের দূরত্ব খুব একটা বেশি নয়। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী কবলিত পশ্চিমবঙ্গের ওই জেলা দুটির 'রাজনৈতিক গুরুত্ব' বাড়লেও, বাংলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সেখান থেকে দ্রুত অবলুপ্তির পথে। কারণ অনুপ্রবেশ সমস্যা মালদা ও মুর্শিদাবাদের গরিমাময় সাংস্কৃতিক চর্চাকে ধর্মান্ধ মৌলবাদী সংস্কৃতি চর্চার দিকে অতি দ্রুত নিয়ে গেছে। সেদিক দিয়ে এক ব্যতিক্রমী সত্তার নাম নদীয়ার গোরভাঙা। লালন ফকির, জালাল আর রেজ্জাকের মতো শিল্পীদের সুর যখন এখানকার সাধারণ মানুষের কণ্ঠে পরিস্ফুট হয় তখন সাঙ্গীতিক জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ বাউল-ফকিরের চিরন্তন গৌরব-ই আসলে মূর্ত হয়ে ওঠে। যার মধ্যে মৌলবাদী রাজনৈতিক চিন্তার কোনও রঙ নেই, আছে মাটির সনাতনী সংস্কৃতির প্রতি অদম্য টান।

তিন দিনের জন্য দেড়শ' ফকির নদীয়া থেকে এবং মুর্শিদাবাদ থেকে ৮০ ফকির এবছরের সঙ্গীত জলসা'র জন্য ঘুরে বেড়ালেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। এমনকী নদীয়া শহরে এই দুর্লভ দৃশ্য দেখা থেকে বঞ্চিত হলো না। এঁরা গাইলেন, মন্ত্রোচ্চারণ করলেন, নাচলেন, সর্বোপরি আম-জনতাকে নাচালেন এবং মাতালেনও। ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতের ওপর ভিত্তি করে, কেউ বা লোকসংস্কৃতিকে ভিত্তি করে সাজিয়েছিলেন তাঁদের সুরের পসরা। সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, আজকের প্রজন্ম এই সনাতনী গ্রাম-বাংলার সংস্কৃতির প্রতি কতটা মনোযোগী? আপাতত তাঁরা সেই বাউল-ফকিরের সুর তুলে এনেছেন বাংলাদেশের হৃদয় থেকে। আজকের প্রজন্ম এতে কতটা মাতবে সে উত্তর বোধহয় ভবিষ্যতের কালগর্ভে।

লেখা-পড়া দামি, ভাতের গ্রাস আরও দামি

শ্রী পূর্ণেন্দু বসু
মাননীয় শ্রমমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মন্ত্রীমশাই, নমস্কার। সাক্ষাতে দেখা হলে পত্রলেখক কুর্নিশ জানাতেও রাজি। কিন্তু চিঠিতে অতটা হয় না।

কলকাতা বইমেলার মাঠে শিশু শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে সত্যি নজির রাখলেন আপনি। প্রথম দিনের বইমেলায় গিয়ে নিজের চোখে দেখলাম শ্রমমন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু মাঠ পরিষ্কারের কাজে নিযুক্ত শিশু শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে এই কাণ্ডের নিন্দাই শুধু নয়, ব্যবস্থাও নিলেন সঙ্গে সঙ্গে। বিশ্বাস করুন প্রথমে বিশ্বাসই হয়নি। চোখ কচলে নিয়ে ফের দেখলাম। হ্যাঁ আপনিই। সেই কাঁচাপাকা দাড়ি। সেই মা-মাটি-মানষের গন্ধ মাখা কুর্তা পাজামা।

মন্ত্রীমশাই জানেন শিশু শ্রমিক নিয়োগের বিরুদ্ধে যতই তৎপর হোক রাজ্য সরকার খোদ কলকাতা শহরেই যত্রতত্র সেই নিয়মভঙ্গ দেখা যায়। কলকাতা বইমেলাতেও এই ছবি আগেও দেখেছি। মাঠে পড়ে থাকা আবর্জনা তোলা কিংবা অন্যান্য নানা কাজ করে চলে ওরা সারাদিন। হাজার মানুষের ভিড়ে কারই বা নজরে পড়ে। বইয়ের খোঁজে থাকা বইপ্রেমীরা কি আর ওঁদের খোঁজ রাখে? আমিই কি রেখেছি কোনও দিন? কিন্তু চোখে পড়ে গেল স্বয়ং শ্রমমন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসুর। সত্যিই দরদি চোখ বটে। খেলার মাঠে এমন বেনিয়ম দেখে আপনি ডেকে পাঠালেন শিল্ড কর্তাদের। তাঁর এসে পৌঁছনোর আগে অবশ্য শিশুগুলিকে যত্ন করে টিফিন খাওয়ালেন আপনি। রাধাবল্লভি, আলুর দম, দানাদার। হয়তো কতদিন পর ওঁরা খেল এমন ফেলে না দেওয়া খাবার।

আপনার ডাক শুনে কিছুক্ষণ পর গিল্ড কর্তা এসে জানালেন এই দায় তাদের নয়। মিলনমেলা প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব দেওয়া ঠিকাদার সংস্থাই নিয়োগ করেছে এঁদের। সঙ্গে সঙ্গে ডাক পড়ল ঠিকাদার সংস্থার মালকিনের। প্রথমে অস্বীকার তারপর মন্ত্রীর সামনে মেনেও নিলেন সব। খোঁজ করে মেলার মাঠে পাওয়া গেল এমন বেশ কয়েকজন শিশু শ্রমিককে। এদের সকলেরই বাড়ি লক্ষ্মীকান্তপুরের দিকে। মন্ত্রিমশাইয়ের এমন কাণ্ড দেখে সন্ধ্যে সন্ধ্যেই বেরিয়ে এলাম আলো ঝলমল মেলা থেকে। একটু আঁধারে দাঁড়িয়ে মনে মনে আপনাকে কুর্নিশ জানাতে জানাতে ভাবলাম প্রথম দিনেই এমন ঘটনার পর এবারের মেলায় হয়তো আর দেখা যাবে না ওদের। কিন্তু বইমেলা কি পারবে ওদের হাতে বই তুলে দিতে? একদিনের টিফিন খাওয়ানো মন্ত্রীও কি পারবেন?

অমন টিফিন তো যে কেউই খাওয়াতে পারে। রাস্তাঘাটে এমন দেখাও যায়। কিন্তু সেসবই তো একদিন বা দু'দিনের। কিন্তু স্থায়ী সমাধান কোথায়? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ রাগ হয়ে গেল মন্ত্রিমশাই জানেন। আপনার ওপরই রাগ হলো। মনে হলো আপনার তো বেশ ক্যামেরায় ছবি উঠল। স্লোগান উঠল এই না হলে শ্রমমন্ত্রী। এই না হলে মা-মাটি-মানুষের নেতা? কিন্তু ওই শিশুগুলো কী পেল? ওঁর তো পেটের জ্বালা মেটানোর কাজটাও হারাল।

মন্ত্রিমশাই, আপনার সরকার তো অনেক কিছু স্বপ্ন দেখাচ্ছে। একবার বলে দেখুন না আপনার আমার দিদিকে। যদি কিছু ব্যবস্থা করেন। পুনর্বাসনের ঘোষণা নয়, শিশু শ্রম বন্ধের হুমকি নয়, একটা মানবিক সমাধান দরকার। যা খুশি করুন। কিন্তু মনে রাখবেন শিক্ষা ছাড়াও ওরা বেঁচে থাকতে পারবে। কিন্তু পেটে এক মুঠো খাবার না পড়লে ওঁদের স্বপ্নের মতো ওঁরাও মরে যাবে।

পরদিন ছিল সাধারণতন্ত্র দিবসের ছুটি। মন্ত্রিমশাই আপনাকে দেখে অনুপ্রাণিত পত্রলেখক কলকাতার পথে বের হলেন শিশু শ্রমিকের খোঁজে। না বেশি দূর যেতে হলো না। বইমেলা থেকে একটু দূরেই এক পরিবারেই মিলে গেল অনেকখানি ছবি। দেখা হলো বিল্টু আর টুম্পার সঙ্গে। বাবা মায়ের সঙ্গে হোটেল চালায় ওঁরা। যেমন বাবা মায়ের সঙ্গে কাগজ কুড়োতে এসেছিল সেই বাচ্চাগুলো।

পূর্ণেন্দুবাবু জানেন, সাধারণতন্ত্র দিবসের মানেই ওরা জানে না। আর পাঁচটা দিনের মতোই ওরা শ্রম বিক্রি করে। ওরা কাজ করে। তেরঙা পতাকা নয়, সেদিনও ওদের হাতে ছিল এঁটো বাসন। মনে হলো ইস্ ওরা কেন মন্ত্রীদের চোখে পড়েন না। সাধারণতন্ত্র দিবসেও তাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা থেকে অনেক দূরে ওরা, ধুলো, বালি, গ্লানির মধ্যে।

পরিচয় হলো বিল্টু গাইনের দাসের সঙ্গে। ২৬ জানুয়ারি আবার ছুটি কিসের? ঘরেতে অভাব। পেটেতে আগুন। তাই কাজ করে রাজু। তবে বিকেলটা ওর নিজের। একই রকম স্কুল, বই, শৈশব না পাওয়া বন্ধুদের সঙ্গে খেলায় মাতে বিকেলটা। ওটুকুই রাজুর স্বপ্ন সঙ্গী।

বিল্টুর বোন টুম্পা। বাবা মায়ের সঙ্গে হাতে হাতে রান্নার ব্যবস্থা করছে। রাস্তার পাশেই ঝোলানো তিনরঙা পতাকাটা ও চেনে। তাই এই অভাগা জীবনেও স্বপ্ন বোনে ঝুম্পা। বাবা মায়ের সঙ্গে সারাদিন রাস্তার হোটেলে কাজ। ধুলো আর ধোঁয়ার মধ্যে মাঝে মাঝে ঝাপসা হয়ে যায় স্বপ্নটা। তবু বুকের ভেতর বাঁচিয়ে রাখা স্কুলে পড়ার ইচ্ছেটা উঁকি মারে বারবার। এখানেই থামিনি মন্ত্রীমশাই। ওঁদের মা মালতী দেবীর সঙ্গেও কথা হলো। বললেন সুন্দরবনের কাছে একটা গ্রামে থাকতেন। নিজেদের জমি নেই। ঘরামির কাজ জানলেও তেমন কাজ নেই স্বামী সন্তানের। কিন্তু ঘরে আছে অনেকগুলো পেটের খিদে। তারপর এই বাইপাসের ধারে হোটেল। একে তাকে পয়সা দিয়েও খেয়ে পড়ে কিছুটা জমে। একটা ছোট্ট জমি কেনার স্বপ্নও জমে। কিন্তু ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে পথের হোটেলে লোক রাখলে সেটুকু আর জমবে না। তাই মালতী দেবী জানেন লেখাপড়া দামি, কিন্তু ভাতের গ্রাস আরও দামি।

মন্ত্রিমশাই এই বাংলার এই কলকাতায় একটা পরিবারের ছবি দেখেই ঘরে ফিরলাম। নেট ঘেঁটে দেখলাম এমন অসংখ্য পরিবার আছে এই শহরেই। মন্ত্রিমশাই, আপনি কয়েকজন শিশু শ্রমিকের পাশে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু মনে রাখবেন, অসংখ্যর সঙ্গে কিছু যোগ বা বিয়োগ হলেও সংখ্যাটা অসংখ্যই থেকে যায়।

নমস্কারান্তে,
—সুন্দর মৌলিক

রাজনীতির শিকার রুশদি

'স্যাটানিক ভার্সেস' (শয়তানের পদাবলী) গ্রন্থের রচয়িতা এবং 'বুকার' জয়ী বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক সলমন রুশদির উপর খড়্গহস্ত হয়েছেন ভারতের সর্বোচ্চ মুসলিম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা ইসলামিক শিক্ষার পীঠস্থান দারুল উলুম দেওবন্দ-এর মৌলবাদী মুসলিম ধর্মীয় নেতারা। এই নেতাদের বিশেষত্ব হচ্ছে, এঁরা ইসলামিক ফতোয়া দানের একমাত্র হকদার! এঁদের নির্দেশ, মুসলিম নারীদের বোরখায় আবৃতা থাকা আবশ্যিক (জনসমক্ষে বের হলে), নারীর উপার্জনের অর্থে পিতা-মাতা, ভাই-বোন প্রভৃতির কোনও অধিকার নেই, নারীদের খেলাধূলা, সঙ্গীতচর্চা, অঐশ্লামিক শিক্ষা নিষিদ্ধ, মুসলমান মাত্রই সিনেমা, টিভি দেখাও নিষিদ্ধ ইত্যাদি। রুশদির উপর বিশ্বের মুসলমান মৌলবাদী, সন্ত্রাসবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীরা খাপ্পা এই কারণে যে রুশদি তাঁর গ্রন্থে মহম্মদকে নাকি 'শয়তান' বলে অভিহিত করে তাঁকে চূড়ান্ত হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। আর এই অপরাধে বিশ্বজুড়ে রুশদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। ইরানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আয়াতোল্লা খোমেনি তাঁর বিরুদ্ধে জারি করেছিলেন মৃত্যুদণ্ড। তাঁর হত্যাকারীকে বিশাল পরিমাণ আর্থিক পুরস্কার দানের কথাও ঘোষণা করেছিলেন তিনি। বিশ্বের বহু মুসলমান সংগঠন, নেতা ও একনায়কও ঘোষণা করেছিলেন রুশদির মাথার দাম। মুসলমান মৌলবাদীরা দাঙ্গা বাঁধিয়েছিল, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ঘটিয়েছিল বহু দেশে। ভারতও বাদ যায়নি। রুশদিকে হাতের কাছে না পেয়ে হাত তুলেছিল হিন্দু, খৃস্টান, ইহুদি, শিয়া মুসলমানদের উপর। উল্লেখ্য, রুশদি জন্মসূত্রে ভারতীয় এবং শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। আশ্চর্যের বিষয়, ইরান শিয়া অধ্যুষিত ও ক্ষমতাসীন। তা সত্ত্বেও ইরানই ছিল সবচেয়ে বড় রুশদি- বিরোধী। প্রায় সব মুসলমান দেশে শিয়ারা সংখ্যালঘু এবং অত্যাচারিত। পাকিস্তানে শিয়ারা তো সরকারিভাবে 'অমুসলমান', 'সংখ্যালঘু' তথা 'কাফের'। খৃস্টান দেশ বৃটেন কিন্তু রুশদিকে ত্যাগ করেনি বা বিশ্বের মুসলমান মৌলবাদীদের দাবি মেনে তাঁকে দেশ থেকে বের করেও দেয়নি। বরং প্রতি বছর হাজার হাজার পাউন্ড খরচ করে তাঁকে 'প্রোটেকশন' দিচ্ছে। তিনি লন্ডনবাসী ভারতীয়, ভারত তাঁর জন্মভূমি, তাই মাতৃভূমির টানে তিনি মাঝে মধ্যেই আসেন এদেশে। তিনি আর যাই হোক, ভারতবিরোধী নন। কিন্তু যারা এদেশে জন্মে, এদেশের খেয়েও স্বপ্ন দেখে পাকিস্তানের, ভারতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন-এর খাতায় নাম লেখায় বা জঙ্গি সেজে জন্মভূমিতে অন্তর্ঘাত- সন্ত্রাস চালায়, রুশদি অন্তত তাদের ন্যায় দেশদ্রোহী নন। সংসদ ভবন আক্রমণের পান্ডা ও মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আফজলগুরুর ন্যায় তিনি ভারতমাতার গায়ে হাত তোলেননি, হত্যা করতেও উদ্যত হননি। অথচ আফজলগুরুর আদর্শে বিশ্ববাসীরা সরকার, শাসকদল কংগ্রেস ও সংখ্যাগুরুদের চোখ রাঙাতে পারে, হুমকি দিতে পারে এবং প্রয়োজনে দাঙ্গা বাঁধাতেও পারে। তাদের ক্রিয়াকলাপ এটাই প্রমাণ করে যে তারাই এদেশে সংখ্যাগুরু। আর তাদের এ সাহস জুগিয়েছে কংগ্রেসসহ সব সেকুলারবাদী পার্টি।

পাঁচ রাজ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া চলছে। কংগ্রেস মুসলমান ভোটে বড় দাঁও মারতে আগ্রহী। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মুসলমানদের মন জয় করতে জয়পুর সাহিত্য উৎসবে রুশদি যাতে যোগদান করতে না পারে সেজন্য দারুল উলুমকে দিয়ে কংগ্রেস তাঁর আগমনে আপত্তি তুলিয়েছে। তাই পাঁচ রাজ্যে নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারে— এই অজুহাত তুলে রুশদিকে ভিসা না দেওয়ার আর্জি জানিয়ে সরকারের কাছে দরবার করেছে দারুল উলুম। কিন্তু প্রশ্ন, নির্বাচনের সঙ্গে রুশদির সাহিত্য উৎসবে যোগদানের সম্পর্ক কী? তিনি তো আর উৎসব মঞ্চ থেকে নির্বাচনী প্রচার করতেন না। কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও কিছু বলতেন বলে মনে হয় না। তাছাড়া ২০০৭ সালেও তিনি ওই একই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন। কই, তখন তো দারুল উলুম তাঁর আগমনে আপত্তি তোলেনি! রাজস্থান (জয়পুর)-এর কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী গেহলট কংগ্রেসের আত্মা-অন্তরাত্মাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এবং 'সিমি'র ভয় দেখিয়ে রুশদির ভারত সফরকে ঠেকিয়েছেন। গেহলটের বক্তব্য, 'সিমি' নাকি তাঁর উপরে আক্রমণ চালাতে পারে। অথচ, গোয়েন্দা সূত্রের খবর, এ ধরনের খবর নাকি তাঁদের কাছে নেই। গেহলট যে মিথ্যে রটিয়েছেন এ ঘটনা তারই প্রমাণ। আসলে দারুল নয়, কংগ্রেসই যে 'নাটের গুরু' তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর রুশদি যে কংগ্রেসের নোংরা ভোট রাজনীতির শিকার সেকথাও আর গোপন নেই। কংগ্রেস তাই আসামীর কাঠগড়ায়। তবে কংগ্রেসের মনে রাখা উচিত, তার বিনাশকাল উপস্থিত। তাই এই বিপরীত বুদ্ধি।

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

'তেঁতুলতলা'য় বাসা

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মনে হয় গণতন্ত্র কথাটির আভিধানিক অর্থ ঠিকভাবে জানা নেই। রাজ্যে এতগুলি মন্ত্রী কিন্তু সর্বজনবিদিত, এদের কোনও প্রস্তাব পাশ করা, কোনও নতুন পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করার কোনও অধিকার নেই যতক্ষণ না ম্যাডাম তাতে সায় দেন। এরই নাম কি গণতন্ত্র?

যদিও বা ওঁর জেদ বজায় রেখে জোট হলো, নির্বাচনের পরে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় সেই জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে প্রতি পদে পদে উন্নয়ন, চাকুরি, ভর্তি ও সাহায্য অনুদানের ব্যাপারে উনি একচক্ষু হরিণীর ন্যায় ব্যবহার করে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গের সর্বধর্মের জনগণের উপর।

প্রথমেই বলি ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে যিনি ভারতবর্ষের সফলতম প্রধানমন্ত্রীদের একজন। কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্বে লবণহ্রদ এলাকায় খড়ের চাল যুক্ত একটি সুন্দর কটেজ নির্মাণ করা হয়েছিল প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর নামে, পরে যে কটেজটি, ভবন অর্থাৎ ইন্দিরা ভবনে পরিণত হয়েছিল। এত জায়গা থাকতে নজরুল ইসলামের পৈত্রিক ভিটা থাকতে ইন্দিরা ভবনের নামবদল করে ওর মধ্যে নজরুল আকাদেমি করার মধ্যে কি যৌক্তিকতা আছে কে জানে! যে কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে কারও ওপর আক্রমণাত্মক মনোভাব শুধু পোষণ নয়, প্রকাশ করাও কোনও সৎ মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষণ নয়। এতেও উনি ক্ষান্ত থাকেননি। সম্প্রতি কলকাতার প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী মহাজাতি সদনকে আধুনিক প্রেক্ষাগৃহে রূপান্তরিত করতে চাইছেন। লোকে আজকাল আর সিনেমা হলমুখী হয় না। ভিডিও, টিভি, সিডির কল্যাণে বাড়িতে নরম বিছানার উপর শুয়ে বসে সিনেমা দেখে। সেখানে নেতাজীর উদ্যোগে নির্মিত ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক নামকরণ করা মহাজাতি সদনকে প্রেক্ষাগৃহে রূপান্তরিত করার মতো মানসিকতা শিক্ষামন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর কেন হলো সেটা বিস্ময়ের ব্যাপার।

তাই পরিশেষে বলি আট মাস আগেও আমরা যা ছিলাম বর্তমানেও সকল ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়াতে আমরা জনগণ যে তিমিরে সেই তিমিরেই। সুতরাং পরিবর্তনের ছোঁয়াচ আমাদের লাগেনি। অর্থাৎ 'টকের জ্বালায় পালিয়ে এসে তেঁতুলতলায় বাসা' করার মতো আমাদের অবস্থা।

—দেবপ্রসাদ সরকার, মেমারী।

খবরের পেছনের খবর

নীতিন রায়

যখন দেবতারা ঘুমোয়, শয়তানেরা তখন জেগে থাকে। ষড়যন্ত্রীরা ষড়যন্ত্রের জাল বুনে যায়। চীনের কুইংদো প্রদেশের বিহাই বন্দর থেকে জাহাজ ছেড়েছে। জাহাজের ভিতর বারুদের গন্ধ। বিহাই থেকে সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে মায়নামার হয়ে হংকং, তারপর সেন্ট মার্টিন দ্বীপ, বাংলাদেশের দক্ষিণে একটি দ্বীপ, বাংলাদেশ থেকে এনথনি সীমারে ও হাফিজুর রহমান দুটি মাছ ধরার ট্রলার নিয়ে সেই দ্বীপে আগেই উপস্থিত। জাহাজ দুটোর নাম 'আমানত' ও 'এফ. বি. খাজারদান'; মাল তোলা হলো ট্রলারে। বাংলাদেশের টেকনাফ হয়ে কক্সবাজার, তারপর চট্টগ্রামের কর্ণফুলির সার কারখানার জেটিতে। বাংলাদেশ মিনিস্ট্রি অব ইন্ডাস্ট্রিজের কব্জায় জেটিটি। পুরো রাস্তাটা নিয়ে এলো বাংলাদেশের কোস্টগার্ড। দিনটি ২০০৪ সালের চার তারিখ। বাংলাদেশ মিনিস্ট্রি অফ ইন্ড্রাস্ট্রিজের অফিসার এসে মাল আনলোড করাবেন। একটু দেরিতে আসলেন তিনি। দুই পুলিশ কর্মী হেলাল ও আলাউদ্দিন হৈ-চৈ বাধিয়ে দিল। তারা সরকারি নির্দেশ জানতো না। আঁতকে উঠলো ভারত। বাংলাদেশের খালেদা জিয়া যেন কিছু একটা ঢাকতে ব্যস্ত।

অস্ত্র এসেছে চীনের নোরিংকো কোম্পানি থেকে। অস্ত্র উৎপাদনে চীনের স্থান তৃতীয়। মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি করে এই কোম্পানীটি। আমেরিকা এই কোম্পানীটির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এফ বি আই-এর জালে আসে পাঁচ চীনা অস্ত্র ব্যবসায়ী এবং এর মাঝে দু'জন নোরিংকো কোম্পানীর প্রতিনিধি। অস্ত্রের পরিমাণ দেখুন— ১২৯০টি মেশিন গান, ৪০০টি সেমি অটোমেটিক গান, ৪০০টি থম্পসন সাব মেশিন গান, ১৫০টি রকেট লঞ্চার, ২০০০টি গ্রেনেড লঞ্চিং টিউব, ৮৪০টি রকেট, ২৪৯৯৬টি হ্যান্ড গ্রেনেড, ১১৪০৫২০টি বুলেট।

বাংলাদেশের সি আই ডি তদন্ত শেষ করেছে। ৩৫০০ পৃষ্ঠার তদন্ত আদালতে পেশ করা হয়েছে, বাংলাদেশের সেনার চার জনের একটি তদন্তকারী টিম তৈরি করে। তদন্তকারী দলের প্রধান মনিরুজ্জামান চৌধুরী বলেন, এই অস্ত্রশস্ত্র ভারতে পাচার করাই উদ্দেশ্য ছিল। এই ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন খালেদা জিয়ার পুত্র তারিক আনোয়ার। সেনা গোয়েন্দা প্রধান ও এন এস আই-এর প্রধান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লুৎফর রহমান বাবরও জড়িত, এরা এখন জেলে। পাকিস্তান হাই-কমিশনের ব্রিগেডিয়ার মগিসউদ্দিন ও কর্নেল শহীদ। বাংলাদেশে তখন খালেদা জিয়ার সরকার। জামাতে ইসলামি ও ইসলামিক ঐক্য জোট ছিল শরিক দল। তাই সরকার ইসলামিক নীতি নিয়ে চলছিল।

অন্যদিকে তখন মোশারফের নাভিশ্বাস উঠে গেছে। ৯/১১-এর কারণে আমেরিকা খুব চাপে রেখেছে পাকিস্তানকে। বহুদিনের লালিত ৫টি জঙ্গি গোষ্ঠীকে নিষিদ্ধ করতে হয়েছে। প্রকাশ্যে জঙ্গি প্রশিক্ষণ বন্ধ। জঙ্গি শিবির ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ১০০ জঙ্গিকে বাংলাদেশে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারমধ্যে আরবের জেহাদি যোদ্ধা রয়েছে।

ডি জি এফ আই বাংলাদেশের সেনা গোয়েন্দা। তার প্রধান ছিলেন মেজর জেনারেল রেজাকুল হায়দার চৌধুরী, তিনি আই এস আই-এর এজেন্ট। এন এস আই এর প্রধান ছিলেন জেনারেল আবদুর রহিম, দুই সংস্থাই আই এস আই-এর হয়ে কাজ করতো।

বাংলাদেশে পরেশ বড়ুয়ার নাম ছিল কামারুজ্জামান। পাকিস্তানের আই এস আই-এর অফিসার মগিসউদ্দিন তার নিরাপত্তার বিষয় দেখতো। মগিসউদ্দিন পরেশ বড়ুয়ার সঙ্গে জাতীয় পার্টির নেতা 'ফারুক অবি'কে পরিচয় করিয়ে দেয়। অবি পরিচয় করিয়ে দেয় হাফিজুর রহমানকে। হাফিজুর রহমান এক কুখ্যাত চোরা কারবারি। তার সঙ্গে যোগ দেয় কুখ্যাত ডিম দাউদ। এন এস আই ও ডি জি এফ আই-এর হাত ধরে চোরাকারবারিদের উপর প্রভাব বিস্তার করে আই এস আই। এন এস আই-এর প্রধান ও আই এস আই-এর এক ডিরেক্টার ষড়যন্ত্র করেন লন্ডনে বসে। আই এস আই, এন এস আই মোবাইল ফোনের উপর নজর রাখার যন্ত্র উপহার দেয়।

এসবের আগে তারিক আনোয়ার ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লুৎফার রহমান বাবর আই এস আই-এর সঙ্গে মিটিং করেন। আর এনথনি সীমারে ম্যানিলা থেকে চিটাগাং আসেন।

হাবিবুর রহমান নামে এক লরির মালিক থেকে দুটি লরি ভাড়া করে এন এস আই এর অফিসার আকবর হোসেন। লরি মালও তোলা হয় কিন্তু গোল বাঁধায় আগে উল্লিখিত দুই পুলিশ কর্মী। লরির মালিক হাবিবুর রহমান গ্রেপ্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবার ভূমিকা সামনে চলে আসে। তারপর হাফিজুর রহমান তার স্বীকারোক্তিতে বলেন, এন এস আই এর প্রধান সেনা ও কোস্ট গার্ডকে ম্যানেজ করেন।

বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুম বলেন, তারা আর বাংলাদেশের মাটিতে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করতে দেবেন না। তিনি শেখ হাসিনার খুব বিশ্বস্ত। বাংলাদেশের তৎকালীন সরকার চেয়েছিলেন ব্যাপারটা ধামাচাপা দিতে। শেখ হাসিনা সরকার তাকে সামনে এনেছে ও তদন্ত করতে সময় নিয়েছে ৭ বছর। চীন-পাকিস্তানের এই ষড়যন্ত্রে বহু ভারতীয়ের প্রাণ যেত, কিন্তু ভগবান সহায় তাই বাঁচোয়া।

শিব-গীতার কথা

রবীন সেনগুপ্ত

হিন্দু সমাজে প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় হলো শ্রীকৃষ্ণ কথিত শ্রীমদ্‌ভগবতগীতা। কিন্তু এই গীতাটি ছাড়াও আরও অনেক প্রকার গীতা হিন্দু শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই গীতাগুলির মধ্যে অন্যতম হলো শিব-গীতা, সুরধুনী গীতা, গুরু গীতা, যম গীতা ইত্যাদি।

রাবণ বধের পূর্বে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সূর্যস্তব, দুর্গা পূজা ও শিব পূজা করেছিলেন। শিব পূজা করার সময় ভগবান শিব শ্রীরামচন্দ্রের সামনে অন্যান্য দেবদেবী সহ আবির্ভূত হন। সেই সময় শ্রীরাম শিবঠাকুরকে নানা প্রশ্ন করেন। উত্তরে শিব যা বলেছিলেন সেইগুলির সংকলনই হলো শিব-গীতা।

শিব-গীতায় কিছু কথা আছে যা শ্রীমদ্‌ভগবতগীতার মধ্যেই রয়েছে। আবার এই শিব-গীতাতেই এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা ভগবতগীতায় নেই। যেমন শিবগীতার অষ্টম অধ্যায় জুড়ে প্রাণী শরীরের উৎপত্তির বিজ্ঞানসম্মত বর্ণনা দেওয়া আছে। এই রূপ বর্ণনা, জনপ্রিয় বহুল প্রচলিত হিন্দু শাস্ত্রগুলিতে থাকে না।

সেখানে বলা আছে শুক্র ডিম্বের নিষেক হলে তবে গর্ভের সঞ্চার হয়। জরায়ুতে যেসব প্রাণীর সন্তান বৃদ্ধি পায় তাদের জরায়ুজ দেহ বলে। এছাড়াও স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ এই তিন প্রকার পাঞ্চভৌতিক দেহও বিশ্বে রয়েছে। এই চার প্রকার পাঞ্চভৌতিক দেহের চেয়েও উৎকৃষ্ট এক প্রকার দেহ রয়েছে যাকে দেবদেহ বলা হয়। এবং চতুর্বিধঃ প্রোক্তো দেহোঽয়ং পাঞ্চ ভৌতিকঃ। মানসস্ত পরঃ প্রোক্তো দেবানামেব স স্মৃতঃ। (শ্লোক ৩+)

নিষেক বলে যে বৈজ্ঞানিক টার্মিনোলজিটিকে আমরা এখন ব্যবহার করে থাকি আয়ুর্বেদ ছাড়াও সেই শব্দটির উল্লেখ শিব-গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ১৩তম শ্লোকে রয়েছে। শ্লোকাংশটি এইরূপ : জন্মকর্মবশাদেব নিষিক্তং স্মরমন্দিরো শুক্রং রজ সমাযুক্তং প্রথমে মাসি তদ্দ্রবম্...

মোক্ষ বা মুক্তি কাকে বলে এই বিষয়ে একটা সুন্দর শ্লোক এই শিব-গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৩২তম শ্লোকে রয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে যে প্রত্যেক বস্তুর যেমন একটি নির্দিষ্ট বাসস্থান থাকে মোক্ষ-র কিন্তু সেইরকম কোনও নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই। আমাদের হৃদয়ের অজ্ঞানতার বিনাশকেই মোক্ষ বলা হয়।

জীবের শরীর যে পাঁচ প্রকারের কোষ দ্বারা নির্মিত এই বৈজ্ঞানিক তথ্য এই শিব-গীতারই চতুর্দশ অধ্যায়ে দেওয়া আছে। এই পাঁচ প্রকার কোষের নাম হল অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, জ্ঞানময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষ, পঞ্চকোষের বর্ণনায় পরিপূর্ণ এই অধ্যায়টির নামই হলো পঞ্চকোষোপপাদনম্ অধ্যায়। শ্রীমদ্‌ভগবতগীতায় যেমন ১৮টি অধ্যায় রয়েছে শিব-গীতায় সেইরূপ অধ্যায়ের সংখ্যা ১৬টি।

পঞ্চকোষের অধ্যায়টি ছাড়াও বাকি ১৫টি অধ্যায়ের নাম হলো— শিবভক্তি উৎকর্ষতা অধ্যায়, বৈরাগ্য উপদেশ অধ্যায়, বিরজা দীক্ষা অধ্যায়, শিব আবির্ভাবে অধ্যায়, রাম বর প্রদান অধ্যায়, বিভূতিযোগ, বিশ্বরূপ দর্শন, পিণ্ডোৎপত্তিকথনম, দেহস্বরূপা নির্ণয়, জীবস্বরূপ কথনম্, জীবগতি নিরূপণ, উপাসনা জ্ঞানফলম, মুক্তিলক্ষণ, ভক্তিযোগ এবং গীতাধিকারী নিরূপণ অধ্যায়।

বিশ্বরূপ দর্শন অধ্যায়ে শিব নিজের বিশ্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়েছেন, যেমনটি অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন ঠিক সেইরকম ভাবেই।

ভগবতগীতার ধ্যানযোগ অধ্যায় থেকে আমরা ধ্যান সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জানতে পারি। উক্ত শিবগীতাতে ধ্যান সম্পর্কে আরও কিছু অজানা তথ্য প্রদত্ত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে যোগসিদ্ধির জন্য ধ্যান করতে হলে ব্রাহ্মমুহূর্ত থেকে ঠিক মধ্যদিবস (অর্থাৎ দুপুর বারোটা অবধি) হলো উপযুক্ত সময়। এরপর ধ্যান করলে সেই যোগীর ক্ষতি হয়ে যায়। তবে সমাধিতে চলে গেলে বা মানস জপের ক্ষেত্রে এরকম কোনও নির্দিষ্ট সময় নাই।

শিবগীতার এই শেষ অধ্যায়ে ধ্যান সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে যে জপমালা ঘোরাতে ঘোরাতে ধ্যানও শাস্ত্র সম্মত। জপমালার গুটির সংখ্যা ১০৮টি হলে ভাল। ৫৪ অথবা ২৭টি গুটিকাতেও জপমালা করা যেতে পারে। স্ফটিকমালা দ্বারা জপ পূর্বক ধ্যান করলে সাম্রাজ্যলাভ, প্রবাল মালায় সর্বলোক বশীকরণ, আমলকী মালায় মোক্ষ, মুক্তামালায় সর্ববিদ্যায় পারদর্শিতা, কুশগ্রন্থি মালায় আধ্যাত্মিক জ্ঞান, পুত্রজীবমালায় শ্রীলাভ এবং রুদ্রাক্ষমালায় জপে সর্বকামনা সিদ্ধলাভ হয়ে থাকে। সোনা দ্বারা নির্মিত বহুমূল্যের জপমালায় অগাধ অর্থলাভ ও রূপা নির্মিত মালায় সৎ-কন্যা লাভ হয়ে থাকে। পারদ মালায় কামনা পূরণ, নীল মরকত মালায় শত্রুগণের ভয় উৎপাদন ও মাণিক্যমালায় জপে ত্রিলোক জয় করা যায় বলে এই শিবগীতাতে ভগবান শিব আমাদের প্রত্যয় উৎপাদন করিয়েছেন।

ধ্যানে বসবার আসনের বিষয়েও দেবাদিদেব এই শিব-গীতায় আমাদের নির্দেশ দান করেছেন। তিনি বলেছেন যে পাথরের বা মাটির উপর বসে ধ্যান করলে রোগ ব্যাধি হয় ও সিদ্ধিতে বাধা পড়ে, কুশাসনে বসে ধ্যান করলে জ্ঞান, পাতার আসনে আরোগ্য, ব্যাঘ্র চর্মাসনে শ্রীলাভ, কৃষ্ণাজিন আসনে মুক্তি, বস্ত্রাসনে লক্ষ্মীলাভ এবং কম্বলাসনে বসে ধ্যান করলে সমস্ত অভীষ্ট বিষয় লাভ হয়ে থাকে। ধ্যানের সময় উত্তর বা পূর্বদিকে মুখ করে বসার নির্দেশও এই শাস্ত্রে রয়েছে।

বাস্তব জীবনেও এইসব নির্দেশ পালন করে যুগযুগান্ত ধরে বহু সাধক সুফল পেয়েছেন। হিন্দু সাধকদের মধ্যে জপমালা ও ধ্যানাসনের যে বিভিন্নতা দেখা যায় তার অনেকগুলিই এই শিবগীতার নির্দেশ থেকে প্রাপ্ত। কাজেই হিন্দুধর্মে এই শিবগীতারও যে যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে এ বিষয়ে আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

চৈতন্যযুগের পরবর্তীকালে নতুন ধারার মন্দির

ডঃ প্রণব রায়

।। পর্ব — ৬ ।।

শ্রীচৈতন্যোত্তর যুগে বাঁকুড়া জেলার সংলগ্ন পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণা শহরের যে মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছে, সেগুলি স্থাপত্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতমানের ছিল এবং এখনও বাংলা শৈলীর এমন অনেক মন্দির আছে যার স্থাপত্য প্রশংসার দাবি রাখে। শুধুমাত্র পাথরের তৈরি 'জোড়বাংলা' (দীর্ঘকাল পরিত্যক্ত, কিন্তু কয়েক বছর আগে নবীকৃত) মন্দিরটি স্থাপত্যের ক্ষেত্রে অনবদ্য। কিছু কিছু মূর্তিভাস্কর্য এটির দেওয়ালে এখনও আছে। মন্দিরটি আগে রাধাকৃষ্ণের ছিল। বহুকাল ধরে পরিত্যক্ত ও ভগ্ন অবস্থায় ছিল। চন্দ্রকোণায় পাথরের তৈরি প্রাচীন মন্দিরও লক্ষ্য করা গেছে। কোনটিরই প্রতিষ্ঠাকাল-জ্ঞাপক কোনও লিপি পাওয়া যায়নি। তবে 'জোড়-বাংলা'র স্থাপত্যদৃষ্টে খৃস্টীয় সতেরো শতকের বলে অনুমান।

চন্দ্রকোণার বেশির ভাগ মন্দির (এখন যা আছে) খৃস্টীয় উনিশ শতকে তৈরি হয়েছিল। স্থাপত্য ও লিপিদৃষ্টে একথা বলা যায়। ভালো 'টেরাকোটা' অলংকরণের কাজও তেমন লক্ষ্য করা যায় না। বেশিভাগ কাজই নিম্নমানের। মিত্রসেনপুর মহল্লায় (পাড়া) শান্তিনাথের 'নবরত্ন' মন্দিরটিতে (১৮২৮ খৃ.) প্রচুর টেরাকোটা অলংকরণ আছে। এছাড়া এই মহল্লায় 'কর'-এদের পাথরে তৈরি রাধাকৃষ্ণের 'চাঁদনি' মন্দির (১৭৮০ খৃ.) প্রাচীনত্ব ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। গোঁসাইবাজারে কয়েকটি মন্দির থাকলেও পরিত্যক্ত বিষ্ণুর 'চাঁদনি' মন্দিরে কিছু টেরাকোটা ও 'পঙ্কের কাজ' আছে। মল্লেশ্বরপুরে মল্লেশ্বরের 'পঞ্চরত্ন' মন্দিরটি স্থাপত্যের ক্ষেত্রে সুদৃশ্য, কিন্তু কোনও ভাস্কর্য নেই। 'দক্ষিণবাজারে' শান্তিনাথের 'নবরত্ন' শৈলীর মন্দিরে 'টেরাকোটা' ও 'স্টাকো'র কাজ কিছু আছে। রঘুনাথপুরে রাধাবল্লভের 'চারচালা' মাকড়া পাথরে তৈরি। ইলামবাজার মহল্লায় রাধাগোবিন্দের 'পঞ্চরত্ন' (১৮৭০ খৃ.)-এ অনেক 'টেরাকোটা'-অলংকরণ আছে। গোবিন্দপুর মহল্লায় 'খল্‌সা' শিবের 'আটচালা'য় 'স্টাকো'র (চুন-বালির তৈরি) কিছু মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। পাশে বিশেষ শৈলীর নহবৎখানা উল্লেখযোগ্য।

চন্দ্রকোণা শহরে যে শিলালিপির মাধ্যমে আমরা প্রাচীন 'ভান'-রাজাদের ইতিহাস জানতে পারি, সেটি এখানে উদ্ধার করা হলো; (যথাযথ সারি ও বানান অনুসারে)

'শুভমস্তু শকাব্দাঃ।১৫৭৭।শাকের্যুশ্বমুনি বাণেন্দৌ
বৈশাখে শুক্লপক্ষকে। তৃতীয়ায়াং ভৃগুদিনে
আরম্ভোস্য বভূব হ।। হরিনারায়ণ ভূপস্য পত্নী
শ্রীলক্ষ্মণাবতী। শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রীত্যৈ নবরত্নমি

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

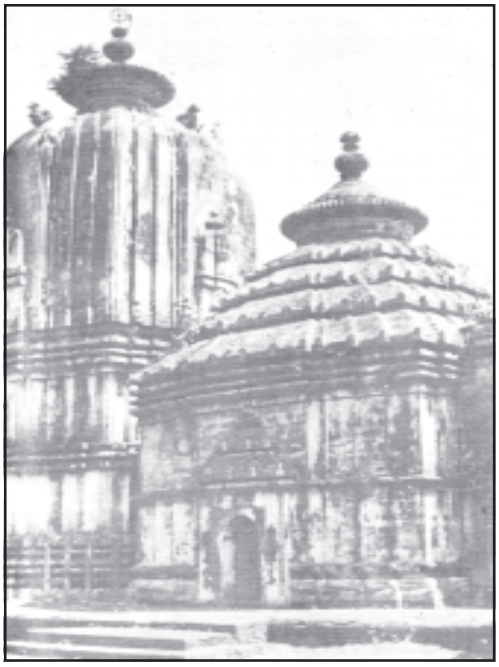

রঘুনাথজীউর দেউল ও জগমোহন রঘুনাথবাড়ি (অযোধ্যা), চন্দ্রকোণা।

দং দদৌ। রাধাকৃষ্ণপদারবিন্দরসিকা
শ্রীবীরভার্ণেবধূখ্যা
ত শ্রীহরিভূপতেশ্চ বনিতা শ্রীহোলরাযাত্মজা।
মাতা
শ্রীযুতমিত্রসেননৃপতে বির্খ্যাতকীর্তেঃ ক্ষিতৌ
শ্রীনারায়ণ মল্লভূপভগিনী রম্যং দদৌ
মংন্দিরং।। গিরিধারিপদাম্ভোজে নবরত্নমি
দং শুভং। নির্মায় বহুযত্নেন সমর্পিতবতী মুদা।।
পৌরাণিক শ্রীমোহন চক্রবর্তী শ্রীগোকুল দাস।'

এ ধরনের নির্ভুল ও বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় রচিত লিপি খুব কমই লক্ষ্য করা যায়। লিপিটির বাংলা অর্থ এখানে দেওয়া হলো :

'শুভ হোক। শকাব্দ ১৫৭৭। অশ্ব (=৭), মুনি (=৭), বাণ (=৫) এবং ইন্দু (=১)-যুক্ত শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৭৭ শকাব্দের ('অঙ্কস্য বামা গতিঃ'— এই নিয়ম অনুসারে ১৫৭৭ হয়) বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে শুক্রবারে (ভৃগুদিনে) এর (মন্দিরের নির্মাণকার্য) আরম্ভ হলো। এই 'নবরত্ন' (নয় চূড়া যুক্ত মন্দির) রাধাকৃষ্ণের প্রীতির জন্য রাজা হরিনারায়ণের পত্নী শ্রীলক্ষ্মণাবতী দান করলেন। (তিনি) রাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মে অনুরাগিণী শ্রীবীরভানির (শ্রীবীরভানেঃ) পুত্র-বধূ, প্রসিদ্ধ রাজা শ্রীহরির (হরিনারায়ণের) পত্নী এবং শ্রীহোলরায়ের কন্যা। রাজা শ্রীযুত মিত্রসেনের মাতা, যিনি পৃথিবীতে কীর্তিমান্ এবং রাজা নারায়ণমল্লের ভগিনী, এই রম্য মন্দিরটি দান করলেন। বহু যত্নে এই শুভ নবরত্নটি নির্মাণ করে (তিনি) গিরিধারীর পাদপদ্মে এটি সানন্দে (মুদ্রা) অর্পণ করলেন। পৌরাণিক মোহন চক্রবর্তী গোকুল দাস।

শিলালিপি থেকে জানা যাচ্ছে, রাণী লক্ষ্মণাবতী গিরিধারীলাল জীউর একটি 'নবরত্ন' মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ১৬৫৫ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সেই 'নবরত্ন' শৈলীর মন্দিরের কোনও অস্তিত্ব এখন আর নেই। বহুকাল আগে সেই মন্দির বিলুপ্ত। শুধুমাত্র শিলালিপিটি অক্ষত। তার থেকে মন্দিরটির অস্তিত্ব ছিল, জানা যায়। কেউ কেউ বলেন, মন্দির লালগড়ে ছিল। লালগড় শহরের কিছু দূরে একটি উন্মুক্ত প্রান্তর, কিন্তু বহু আগে এটি যে একটি 'গড়' ছিল; তার কিছু চিহ্ন এখনও আছে। রঘুনাথবাড়িতে লালজীউর 'আটচালা'-রীতির যে বৃহৎ মন্দিরটি মাকড়া পাথরে নির্মিত হয়েছিল, সেটি কয়েকবছর আগে বিধ্বস্ত। তার বারান্দায় এই বৃহৎ শিলালিপিটি ছিল। বেশ কিছুকাল আগে সেটি স্থানান্তরিত (সম্ভবত চন্দ্রকোণার রামানুজসম্প্রদায়ের 'অস্থলে' সেটি রক্ষিত আছে)। এটি একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক শিলালপি। অতএব সযত্নে সেটি রক্ষা করা উচিত। লালজীউর বিধ্বস্ত মন্দিরটি 'নবরত্ন'-রীতির নয়। অতএব অনুমান করা যায়, গিরিধারীলালজীউর সুদৃশ্য 'নবরত্ন' মন্দিরটি (১৬৫৫ খৃ.) ধ্বংস হয়ে গেলে তার প্রতিষ্ঠাকালীন লিপিটি পরবর্তীকালে রঘুনাথবাড়িতে নির্মিত লালজীউর উক্ত মন্দিরে রাখা হয়। 'রঘুনাথবাড়ি'র মন্দির কে বা কারা প্রতিষ্ঠা করেন, এখন আর জানার উপায় নেই। অনুমান, বর্ধমান কীর্তিচন্দ্র (১৭০২-১৭৪০ খৃ.) প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

মানুষের দুর্ভাগে ভুক্তভোগী নারী

প্রীতি বসু

উন্নয়ন (উচ্ছেদের পোশাকী নাম), খরা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, দাঙ্গা— প্রতিটিতেই মানুষ মানসিক ও শারীরিক উভয় দিক থেকেই ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু এর দায় নারীকেই বিশেষভাবে বহন করতে হয়।

বেশ কয়েক বছর ধরে কলকাতাতে উচ্ছেদ (উন্নয়নের নামে) নিত্যকার ঘটনা হয়ে উঠেছে।

দেশভাগের পর হাজার হাজার মানুষ পশ্চিমবঙ্গে এসে উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার বনজঙ্গল, খালপাড়, জলাভূমি প্রভৃতি পরিষ্কার করে, ভরাট করে বসবাস শুরু করেছেন। সেগুলির নাম হয়েছে 'কলোনি'। সরকারও গ্রামাঞ্চলের না-খেতে-পাওয়া মানুষদেরকে কলকাতাতে অল্প পয়সার ঠিকা কাজ দিয়ে কলকাতাকে সুন্দর করে গড়ে তুলবার উদ্দেশ্য এখানে নিয়ে এসেছেন। দিনে দিনে ভোটের স্বার্থেই উপরোক্ত ব্যক্তিদের রেশন কার্ড দেওয়া হয়েছে। ভোটার লিস্টে তাদের নাম উঠেছে। অন্যান্য নানান রকমের সুযোগ-সুবিধাও তাঁদের দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু সরকারই আবার শহর উন্নয়নের নামে তাঁদের বাস্তুচ্যুত করতে লেগে পড়েছে। নাম দিয়েছেন ওইসব মানুষ জবর দখলদার। তাই তাঁদের উপর লাঠি চালিয়ে, আগুন দিয়ে বাস্তু পুড়িয়ে দিয়ে তাঁদের দিশেহারা করে দিচ্ছে। পুনর্বাসনের যথাযথ ব্যবস্থা তো তেমন দেখা যায় না।

এর ফলে পুরুষেরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন আর নারীরা জীবন বাঁচাতে, সম্ভ্রম বাঁচাতে, সংসার বাঁচাতে ভীষণভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছেন।

জেনেছি, বেশ কয়েক বছর আগে মানিকতলা বাগমারী অঞ্চলের খালপাড়বাসীদের উচ্ছেদের সময় একটা মেয়ে জানিয়েছিল তার নাম বাসন্তী মণ্ডল। সে শ্রীবিদ্যামন্দির স্কুলে ক্লাস টেনে পড়ে। তারা তিন ভাই বোন। দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। ভাই পড়ে ক্লাস নাইনে, স্কুল— ইস্ট ক্যালকাটা ন্যাশানাল স্কুল। বাবা-মা অনেক খেটে-খুটে সংসার চালায়। তারা সুন্দরবনের লোক। সেখানে তাদের কিছু নেই। এখানকার আস্তানাটুকুও ভেঙে দিলে তাদের যে কী হবে! সামনেই পরীক্ষা। পড়াশুনোই-বা কীভাবে চালাবে! কিশোরীর দুচোখে প্রশ্ন— তার তো জন্ম এখানে, বাবা-মা ভোটও দেন। তবু তাদের কেন এই অবস্থা? কিশোরী ভবিষ্যতের নারী। তার মাথায় নেমে এসেছে জীবনের দুর্ভোগের

চিন্তা। টালিনালায় ঝুপড়ি উচ্ছেদের সময় দেখা গিয়েছিল— ঝুপড়িগুলিতে অনেক মহিলা একা থাকেন। তাঁরা সাধারণত বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা। তাঁদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। দীর্ঘদিন এক জায়গায় বসবাসের ফলে তাঁরা তাঁদের নিরাপত্তার একটা ব্যবস্থা করে নেন। কিন্তু উচ্ছেদের ফলে তাঁরা দিশেহারা হয়ে এরকম দুর্ভোগের কবলে পড়ে যান। এতো গেল ঝুপড়ি উচ্ছেদের কথা। এই যে একেক সময় সরকার আগেপিছে না দেখে ফুটপাথের দোকানদারদের উচ্ছেদের ব্যবস্থা করেন, তার ফলেও নারীদেরকেই দুর্ভোগে পড়তে হয়। পুরুষদের আয় না থাকায় সংসারের খরচ দিতে পারে না। ফলে স্ত্রীকে ছেলেমেয়েদের নিয়ে শহরের আস্তানা ছেড়ে গ্রামাঞ্চলের দিকে চলে যেতে হয়। স্বামীর কাছ থেকেও তারা সংসার খরচ পায় না, আবার শহরেও তারা কিছু না কিছু করে যে আয় করতো তাও তাঁদের বন্ধ হয়ে যায়। ছেলে-মেয়ে নিয়ে তাঁরা দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে যান। এখানে একটা বিরাট প্রশ্ন— সরকার ফুটপাথে দোকান বসবার আগেই ব্যবস্থা করেন না কেন? বাস্তবিকভাবে বলতে হয় বিশেষভাবে ফুটপাথে দোকান বসার ব্যাপারে উচ্ছেদ নিয়ে যেন ছেলেখেলা হয়। কিন্তু উচ্ছেদের ঝড় ঝাপটার দাপট তো থাকেই। তার বেশির ভাগটারই ধাক্কা নারীদেরই সামাল দিতে হয়।

উচ্ছেদের সঙ্গে পুনর্বাসন কথাটি আছে ঠিকই। কিন্তু ক'জন পায় পুনর্বাসন তা বলতে গেলে ধন্দে পড়ে যেতে হয়। তাই উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে নারীদেরও দুর্ভোগের দায় থেকেই যায়।

আর শুধু উচ্ছেদ কেন, নারীদের দুর্ভোগের দায় তো তাঁদের পদে পদেই রয়েছে।

ধর্ষিতা নারীর কাহিনী তো নিত্যকার ঘটনা। বিচারের কাঠগড়ায় তা এসে পড়লে দেখা যায়। ধর্ষিতা নারীর জীবনে ক্ষতির মূল্যায়ন হয় টাকায়। শুধু নারী নয়, তাঁর অঙ্গের সঙ্গে অন্য একটা জীবন যুক্ত থাকলেও তাঁদের জীবনব্যাপী দুর্ভোগের মূল্যায়ন হয় টাকায়। তবে সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে দুর্ভাগা নারীও টাকাকে হেলায় সরিয়ে দিয়ে সামাজিক সম্মানের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

নারীর দুর্ভোগের যে কতরূপ! সম্প্রতি জানা গেছে— এক গ্রাম্য গৃহবধূ সুপুরী বিক্রি করে সংসারের চাল কেনায় শ্বশুর-পরিবারের লোকের হাতে তাঁকে নির্মমভাবে নিগৃহীত হতে হয়।

আবার গৃহবধূ কন্যাসন্তানের জন্ম দিলে বা বার বার কয়েকটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিলে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বা স্বামীর দৃষ্টিতে সন্তোষ ফোটে না। ফলাফলে বধূর উপর অত্যাচারের রূপ ধরে নানান রকম দুর্ভোগ নেমে আসে।

সবশেষে বলি, চিরাচরিত কথিত আছে সহনশীলা ধরিত্রীর বাস্তবরূপ নারী। তাঁর দুর্ভোগের দায়ভারের ফিরিস্তি অশেষ। 'যতকষ্ট সহে নারী, ততোকষ্ট দেন বিধি।'

কনসার্ট ফর যূথিকা রায়

৯০ বছর পূর্তিতে যূথিকা রায়ের সম্মাননা

বিকাশ ভট্টাচার্য

'বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে রত্ন যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা গান'— রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে কোনও অতিশয়োক্তি ছিল না। সত্যিই, বাঙালীর একান্ত নিজস্ব ও উজ্জ্বল অর্জন তার গান। বাংলা গান। বিচিত্রমুখী বাংলা গানের জগৎ নানা সময়ে সমৃদ্ধ করেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে জীবন্ত কিংবদন্তী নব্বই-উত্তীর্ণ যূথিকা রায়। তাঁকে বলা হোত ভজন সম্রাজ্ঞী। এক সময় ভজন গান গেয়ে সারা বিশ্ব ঘুরে বেড়িয়েছেন দু'জন শিল্পী, একজন এম. এস. শুভলক্ষ্মী ও অন্যজন আমাদের যূথিকা রায়। এঁদের কৃতিত্ব সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষই বিশেষ করে আজকের প্রজন্ম তেমন ওয়াকিবহাল নন। অথচ সামনে এগিয়ে যেতে হলে এঁদের অবদান সম্বন্ধে জানাটা জরুরি। এই জরুরি কাজটিই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে করে চলেছেন 'মিউজিক্যাল ফিঙ্গার্স' নামে এক সাংস্কৃতিক সংস্থা।

সম্প্রতি রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে যূথিকা রায়ের ৯০ বছর পূর্তিতে 'কনসার্ট ফর যূথিকা রায়' নামে এক অত্যন্ত সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে 'মিউজিক্যাল ফিঙ্গার্স'। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে ইন্দ্রাণী সেন, শ্রীকান্ত আচার্য, সুস্মিতা গোস্বামী ও মন্দিরা লাহিড়ি সময়োচিত গান গেয়ে কিংবদন্তী এই শিল্পীর প্রতি সম্মান জানালেন। তাঁর উপস্থিতিতে, তাঁর সামনে গান গাইতে পেরে এই সব সন্তানসম শিল্পীরা স্বভাবতই আপ্লুত। এঁদের মধ্যে সকলেই যূথিকা রায়ের রেকর্ড করা কিছু গান গেয়ে শোনালেন। আবৃত্তিতে ছিলেন বিজয়লক্ষ্মী বর্মন ও ঘোষণায় দেবাশিস বসু।

১৯০২ সালে হাওড়ার আমতায় জন্মগ্রহণ করেন যূথিকা রায়। পিতা সত্যেন্দ্রনাথ ও মাতা স্নেহলতা দুজনেই ছিলেন সঙ্গীতপ্রেমী। তাই ছোট থেকেই সঙ্গীতের পরিমণ্ডলেই বেড়ে উঠেছেন তিনি। মাত্র ৭ বছর বয়স থেকে অনুষ্ঠানে গান গাইতে শুরু করেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছেন 'আর রেখো না আমায়'। বাবা ছিলেন স্কুল ইন্সপেক্টর। একসময় কলকাতায় চলে এলেন। প্রথাগত সঙ্গীতশিক্ষা নিয়েছেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। ১৯২৭ সালে যখন অল ইন্ডিয়া রেডিও শুরু হয়, তখন প্রথম শিল্পী ছিলেন এই যূথিকা রায়। ১৯৭৭ সালে যখন অল ইন্ডিয়া রেডিও-র ৫০ বছর পূর্তির স্মারক অনুষ্ঠান রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত হয় তখন মঞ্চে ছিলেন যূথিকা রায়। তৎকালীন তথ্য ও বেতারমন্ত্রী এল. কে. আদবানী প্রধান অতিথির ভাষণে বলেন, 'অবিভক্ত ভারতের করাচী শহরে খুব ছোটবেলায় তিনি তাঁর মায়ের পাশে বসে ভজন শুনতেন যে কিন্নরকণ্ঠী শিল্পীর তাঁর সামনে আসতে পেরে আজ আমি ধন্য। 'তাঁর প্রথম রেকর্ড 'আমি ভোরের যূথিকা' এবং 'সাঁঝের তারকা আমি'। প্রণব রায়ের কথায় সুর দেন কমল দাশগুপ্ত। এরপর প্রায় ১৫০টি গান তিনি কমল দাশগুপ্তের সুরে গেয়েছেন। তার বেশির ভাগই কাজী নজরুল ইসলামের লেখা। ১৯৪৭ সালে যখন দেশ স্বাধীন হয় তখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর অনুরোধে তিনি বেতারে গান করেন। গান করেন ততক্ষণ যতক্ষণ না ইউনিয়ন জ্যাক নেমে ত্রিবর্ণ পতাকা উড্ডীন হয়। সেদিন সারাদেশে বেতারে প্রচারিত হয় তাঁর গান 'সোনে কা হিন্দুস্থান হামারা'। এরপরই দাঙ্গাবিধ্বস্ত পশ্চিমবঙ্গে শান্তিকামনায় যখন বেলেঘাটায় গান্ধীজী অনশন করছেন, তখন তিনি ডেকে নিয়েছিলেন শিল্পীকে। শান্তিকামনা করে যে মহতী জনসভায় গান্ধীজী বক্তব্য রাখেন, সেই সভার শেষে যূথিকা রায়ের গান হয়। গানটি ছিল 'ওরে নীল যমুনার জল'। গান্ধীজীর মৃত্যুর পর নেহেরুর অনুরোধে সারাদিন রেডিওতে রামধুন হয়। সেই গান গেয়েছিলেন যূথিকা রায়। সারা বিশ্বে সেদিন এই অনুষ্ঠান বেতারে প্রচারিত। শিল্পী বিবাহ করেননি। তিনি বলেন, 'গানই আমার প্রাণ, আমার জীবন'। ১৯৪২ সালে তিনি দীক্ষা নেন। তিনি মনে করেন, যেখানে গান সেখানে ভগবান। সেদিন অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে তিনি মঞ্চে আসেন। ভারত সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের অধীন পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের প্রধান অনুপ মতিলাল তাঁর হাতে শ্রদ্ধার্ঘ্য তুলে দেন। সবশেষে শিল্পীর জীবন নিয়ে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। মিউজিক্যাল ফিঙ্গার্সের প্রধান শানলি বসুরায়কে ধন্যবাদ, এমন একটি জরুরি কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করার জন্য।

কোকিল স্যার

ইদানিং বেশকিছু নাটক ছোটদের কথা ভেবে হচ্ছে। প্রচেত গুপ্তর গল্প নিয়ে রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর নাট্যরূপ ' কোকিল স্যার' সম্প্রতি নিয়মিত মঞ্চস্থ করছে হাওড়ার শিল্পী সঙ্ঘ। ভীষণ রাগী অঙ্কের স্যার, যিনি ছাত্রদের পাশের থেকে ফেল করাতে বেশি পছন্দ করেন। হঠাৎ তাঁর বাঘের মতো গলা দিয়ে কীভাবে যেন কোকিলের কুহুরব বেরোতে লাগল। তাঁর এই রূপান্তর নিয়ে নাটক এগিয়ে চলে। তিনি ছাত্রদের দু-হাত খুলে নম্বর দিতে থাকেন। উপস্থিত ক্ষুদে দর্শকদের নির্মল হাসি আর কুহু ডাক বুঝিয়ে দেয় এ নাটক যাদের জন্য তারা সাদরে তা গ্রহণ করেছে। দলগত অভিনয় ভালো। কিশোর শিল্পীদের অভিনয় প্রশংসাযোগ্য। মঞ্চসজ্জায় অভিনবত্ব আছে। নাটকটির নির্দেশক সৌমিত্র বসু।

আইন ঠেকাতে আইনসভা ভাঙ্গা অপরাধ নয়

শিবাজী গুপ্ত

''Extra-Constitutional Authority'' ''সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতা কেন্দ্র'' কথাটি গত শতাব্দীর সত্তর/আশির দশকে অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে শাসন-ব্যবস্থার উপর তস্য কনিষ্ঠ পুত্র সঞ্জয় গান্ধীর অবৈধ হস্তক্ষেপ ও হম্বিতম্বিকে লক্ষ্য করে প্রায়ই উচ্চারিত হোত বিরোধীদের মুখে। তারই নতুন সংস্করণ বলা যায় কংগ্রেস-মাতা সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে গড়া ''National Advisory Council''-কে। এটি যেভাবে গঠিত হয়েছে এবং যে কার্যক্রম প্রকাশিত হয়েছে সে প্রেক্ষিতে এই প্রতিষ্ঠানকে নিঃসন্দেহে ''National Adversery Council'' বা জাতীয় শয়তানি চক্র বলা যায়। এটির কোনও সাংবিধানিক বৈধতা নেই— কিন্তু সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার ও সরকার পরিচালনায় অবৈধ হস্তক্ষেপের যোল আনা ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রে একটা সমান্তরাল শাসনকেন্দ্র সৃষ্টি করে সোনিয়া গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী হতে না পারার ক্ষোভ ও বেদনাকে প্রশমিত করতেই এই অসাংবিধানিক শক্তি কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। তাই একে 'জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ' না বলে 'জাতীয় উপদংশ পরিষদ' বলাই সঙ্গত। কারণ, নোংরা রোগের ঘায়ের মতোই এটিকে ভারতবাসীর ঘাড়ে চাপানো হয়েছে।

১৯০৫ সাল থেকে নানাভাবে বাংলার মাটিকে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করে হিন্দুদের মেরুদণ্ড ভাঙার কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন লর্ড কার্জন। তার অভিলষিত 'Settled Fact'-কে 'Unsettled' করেছিল বাঙালী হিন্দুরা। মাত্র ছ' বছরের মধ্যে বৃটিশ সিংহের দর্পচূর্ণ হলো। ১৯১১ সালে ভাঙ্গা বাংলাকে জোড়া দিতে বাধ্য হলো। কিন্তু জাত-সাপ মাজা ভাঙলেও ছোবল দিতে ছাড়ে না। বাংলার মাটি জোড়া দিতে বাধ্য হলেও বৃটিশ আমলাতন্ত্র মানুষ ভাগ করে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছিল— হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক নির্বাচন ও আসন সংরক্ষণের সূচনা করে। কাগজপত্রের বিভাজন রক্তের অক্ষরের বিভাজনে পর্যবসিত হলো ১৯৪৭ সালে।

বাংলা ও পাঞ্জাবকে বলি দিয়ে লব্ধ স্বাধীনতার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে মাটি ভাগ ও মানুষ ভাগের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ''Divide & Rule'' নীতিকে চিরতরে কবর দেবার সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল কংগ্রেস নেতাদের হাতে। কিন্তু ''Divide & Rule'' নীতিই তাদের ক্ষমতার দোরগোড়ায় পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। বৃটিশ সরকার এই নীতি অনুসরণ না করলে, তাদের হাতে দেশ শাসনের ক্ষমতা কোনও মতেই আসত না। সেই কৃতজ্ঞতা বোধেই বৃটিশের বিদায়লগ্নে এরোড্রামে কংগ্রেস নেতারা হাপুস নয়নে কেঁদেছিল। এবং Divide & Rule নীতিকেই সরকারী নীতিরূপে আঁকড়ে ধরেছিল।

সারা বিশ্বে নিন্দিত ও ঘৃণিত ইসলামী বর্বরতাকে ভারতে স্থায়ী ও নিরাপদ আশ্রয় দানের জন্যই তৈরি হয়েছে ''Prevention of Communal and Targetted Violence Bill, 2011''। এই বিল পাস হলে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে একটি কথা বলা বা লেখা যাবে না। মুসলমান সন্ত্রাসবাদীদের নামোল্লেখ করা যাবে না। তাদের কুকীর্তির সমালোচনা করা যাবে না। হিন্দুদের জীবনে নেমে আসবে মগের মুলুক, সারা দেশ হবে মুসলমান ও খৃস্টান হার্মাদ, জল্লাদ, বোম্বেটে, পাইরেট ও তালিবানদের নির্ভয় চারণভূমি; আর হিন্দুদের বধ্যভূমি।

আজ ১০০ বছর পরের ১৯১১ সালের মানুষ ভাগের নীতিই পূর্ণোদ্যমে ও পরিবর্ধিত আকারে প্রচলন করতে চলেছে কংগ্রেস সরকার। মুসলমান ও খৃস্টান সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ রেখে হিন্দু সমাজকে খণ্ড-বিখণ্ড করার নীতি গ্রহণ করেছে শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়েই। জাতের ভিত্তিতে হিন্দুদের বর্ণ হিন্দু ও তফশিলী হিন্দুতে ভাগ করার বৃটিশ নীতি তো বহাল রাখলই, তদুপরি বর্ণহিন্দুদের মধ্য থেকে 'ওবিসি' নামে নতুন এক শ্রেণী বের করে হিন্দু সমাজকে তিন ভাগ করা হলো। তাতেও শান্তি নেই। ওবিসি বা পিছড়ে বর্গকেও ''অতি পিছড়ে বর্গ'' নামে ভাগ করে দুর্বল হিন্দু সমাজকে আরও দুর্বল করে মুসলমান ও খৃস্টানদের সহজ শিকারে পরিণত করা হয়েছে।

যারা জাতের নামে বজ্জাতি বলে চেঁচায়, জাত-ব্যবস্থার উচ্ছেদের গলা ফাটায়, মনু প্রবর্তিত চার-জাত (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) ব্যবস্থাকে শাপ- শাপান্ত করে, তারা সেই চার জাতকে ৪০০ জাতে বিভক্ত করে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েছে। যারা জাত-ব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে শিক্ষা ও শাসন ক্ষেত্রে ''ডুডু ও টামাকু'' খাচ্ছে তারাই জাত ব্যবস্থার নিন্দায় পঞ্চমুখ। অথচ শিক্ষার প্রসারে ও আর্থিক উন্নয়নে সকলের সমানাধিকারের ব্যবস্থা থাকলে সমাজ সাম্য দ্রুততর হোত, সমাজ-সংবদ্ধতা দৃঢ়তর হোত, জাত-ভাঁড়িয়ে জীবনযাপনের হীনমন্যতা দূর হোত। কিন্তু জাত নিয়ে রাজনীতি করার সুযোগ থাকত না। তাই জাতপাত নিপাত যাক : জাতব্যবস্থা দীর্ঘজীবী হোক!

ধর্মের ভিত্তিতে দেশ যখন মেনেই নেওয়া হলো, এবং মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান সৃষ্টি হলো, তখন হিন্দুদের জন্য নির্দিষ্ট অংশকে হিন্দুস্থান নাম দিতে আপত্তি কি ছিল। নীতি আদর্শ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগের কাছে যখন নতি স্বীকার করাই হলো, তখন হিন্দুস্থানে হিন্দুর অগ্রাধিকার ঘোষণা করা এবং Majority-Minority ইত্যাদি জুয়াচুরির আশ্রয় না নিয়ে পরিষ্কার হিন্দু-মুসলমানকে যে যার পরিচয় দেবার সাংবিধানিক অধিকার দেওয়া হলো না কেন? মৌলানা আবুল কালাম আজাদ নামক যে জাতীয়তাবাদী তরমুজ ভারতে থেকে গেল, তার মন রক্ষার্থেই ভারতে থেকে যাওয়া মুসলমানদের রক্ষণাবেক্ষণ, দাড়ি টুপি রেখে মসজিদ মাদ্রাসাসহ সংরক্ষণের গ্যারান্টি দিয়ে, দিনে পাঁচ ওয়াক্ত আল্লার নামে চিল্লিয়ে কান ঝালাপালা করার অধিকার দেওয়া হলো। আর

হিন্দুদের হিন্দু নামে পরিচয় দেবার অধিকারও দেওয়া হলো না। হিন্দুদের পরিচয় হলো কখনও General, কখনও Majority কখনও বা Non-Muslim হিসাবে।

কিন্তু কখনওই হিন্দু বলে নয়, ইংরেজরা শয়তানি করেই হোক কিংবা কোরান-হাদিসের নির্দেশ মেনেই হোক, হিন্দু আর মুসলমান যে দুটি পৃথক জাতি, তা ক্ষমতা হস্তান্তরকালেই লিখিতভাবে বলে দিয়েছে। তা না হলে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা পাকিস্তানে যাবার কথা বলত না। কিন্তু জল ঘুলিয়ে খাবার জাত হিন্দু কংগ্রেসীরা ভারতীয় সংবিধান থেকে 'হিন্দু' শব্দটি বাদ দেবে কেন? কারণ, যে পরিবারে মুসলমান রক্ত, খৃস্টান রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে, সে দূষিত রক্ত থেকে উৎপন্ন পুরুষ বা মেয়েরা কখনওই হিন্দু নামোচ্চারণ করে তাদের রক্ত শোধন করবে না। সুতরাং, সে মানসিকতা থেকেই ২০ কোটি অহিন্দুদের হাতে ১০০ কোটি হিন্দুর উপর নজরদারি খবরদারি ও জারিজুরি করার অধিকার দান মানসে ''National Advisory Council''-এর চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধীর এই অপচেষ্টা। শকুনির কুপরামর্শে কুরুবংশ ধ্বংস হয়েছিল; আর ইটালী থেকে উড়ে এই মহিলা শকুনি হিন্দু বংশ ধ্বংস করার কাজে মেতেছে। মুসলমানদের ঢাল করে খৃস্টান রাজত্ব কায়েম করার অশুভ খেলা শুরু করেছে। সারা বিশ্বে নিন্দিত ও ঘৃণিত ইসলামী বর্বরতাকে ভারতে স্থায়ী ও নিরাপদ আশ্রয় দানের জন্যই তৈরি হয়েছে ''Prevention of Communal and Targeted Violence Bill, 2011''। এই বিল পাস হলে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে একটি কথা বলা বা লেখা যাবে না। মুসলমান সন্ত্রাসবাদীদের নামোল্লেখ করা যাবে না। তাদের কুকীর্তির সমালোচনা করা যাবে না। হিন্দুদের জীবনে নেমে আসবে মগের মুলুক, সারা দেশ হবে মুসলমান ও খৃস্টান হার্মাদ, জল্লাদ, বোম্বেটে, পাইরেট ও তালিবানদের নির্ভয় চারণভূমি; আর হিন্দুদের বধ্যভূমি।

সেই সঙ্গে ভারতমাতাকে খণ্ডখণ্ড করে মুসলমান ও খৃস্টান দেশদ্রোহীদের মধ্যে বিলিবন্টনের ব্যবস্থা। আমেদ প্যাটেল আবার সোনিয়া গান্ধীর পরামর্শদাতা। তারা এর চেয়ে ভালো পরামর্শ কি সোনিয়া গান্ধীকে দিতে পারে? সুতরাং বাস্তব পরিস্থিতির সম্মুখীন না হয়ে হিন্দু সমাজ ক্রিকেট খেলা ও সিরিয়ালে মজে থাকলে তাদের অবলুপ্তি ভগবানের বাবাও ঠেকাতে পারবে না। এই আইনকে ঠেকাতে যদি আইনসভাকে ধ্বংস করতে হয় সে ভি আচ্ছা!

শব্দরূপ-৬১২ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

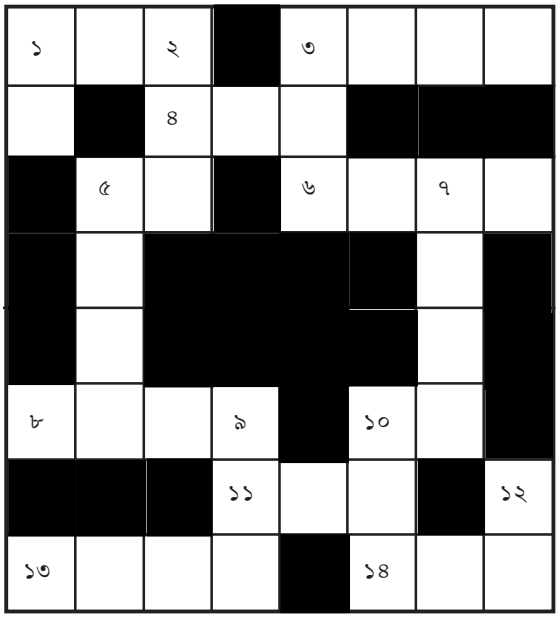

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. আকাশ ও পৃথিবী, **৩.** তৃতীয় আশ্রম, প্রৌঢ় বয়সে গৃহত্যাগ করে বনে বাস করা, **৪.** কলার ভেলা, **৫.** গোমূত্র, **৬.** ইন্দ্র; প্রথমার্ধে অশনি, **৮.** যমুনার গর্ভস্থ গর্ত যেখানে কৃষ্ণ কর্তৃক দমিত কালিয় নাগ বাস করিত, **১০.** জাতি বিশেষ যারা প্রাচীনকালে ভারতে ও পারস্যে বসতি স্থাপন করেছিল, **১১.** অশ্বারোহী সৈন্যদল, **১৩.** অগস্ত্যপত্নী, **১৪.** বাসুকির ভ্রাতা (পরীক্ষিৎকে দংশন করেছিল); ছুতার।

উপর-নীচ : ১. যজ্ঞ, **২.** জমির প্রান্ত, চৌহদ্দি, **৩.** ইন্দ্র, প্রথমার্ধে বাসস্থান, **৫.** যে বালিতে নৌকা, জন্তু ইত্যাদি ডুবিয়া যায়, **৭.** পরস্ত্রীগমন, **৯.** হলুদ, মূলবিশেষ (মসলা), **১০.** জ্বলন্ত অঙ্গার, **১২.** টিয়াপাখী।

সমাধান
শব্দরূপ-৬১০
সঠিক উত্তরদাতা
সুনীল কুমার বিষ্ণু
সিউড়ি, বীরভূম
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

■	■	অ	রু	ন্ধ	তী	■	স
য	যা	তি	■	■	ব	■	হি
■	মি	■	তা	■	র	ভ	স
■	নী	হা	র	■	■	জ	■
■	কা	■	■	কা	ল	না	■
অ	ন্ত	রা	■	শ	■	ল	■
র্কে	■	ঘ	■	■	প	য়	লা
স্ট্রা	■	ব	ন	স্প	তি	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৬১২ সংখ্যার সমাধান আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ সংখ্যায়

।। চিত্রকথা।। শ্রীরামের পূর্বপুরুষ দিলীপ।। ৯

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী উৎসব

বিবেকানন্দ সেবা ভারতীয় শোভাযাত্রা

গত ১২ জানুয়ারি স্বামীজীর সার্ধশতবর্ষ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে দক্ষিণেশ্বর বিবেকানন্দ সেবা ভারতীর দুঃস্থ শিশু কিশোর কিশোরীদের খাতা ও কলম দানের মাধ্যমে তাদের জন্মজয়ন্তী উৎসব পালন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। আর গত ১৫ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিল বর্তমান ও ভবিষ্যতের যুবক ও যুবতীরা। গেরুয়া ধ্বজ হাতে, স্বামীজীর বাণী লেখা প্ল্যাকার্ড এবং মুখে স্বামীজীর জয়ধ্বনি নিয়ে আলমবাজার, দক্ষিণেশ্বর ও আদ্যাপীঠ অঞ্চল পরিক্রমা করে এই শোভাযাত্রা। এলাকার মানুষ অনেকদিন পরে এরকম সুন্দর, সুশৃঙ্খল, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা দেখলেন। শোভাযাত্রার সূচনা হয় স্বামীজীর স্মৃতি বিজড়িত আলমবাজার মঠ থেকে। সূচনা করেন মঠের অধ্যক্ষ মধু মহারাজ। এই উপলক্ষে তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মহারাজজী এলাকায় সেবাভারতীর সেবা কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। উপস্থিত যুবশক্তিকে আহ্বান করে তিনি স্বামীজীর সেবা ও ধর্মের শিক্ষাকে পাথেয় করার উপদেশ দেন। তারপর স্বামীজীর ও ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্প নিবেদনের মাধ্যমে শোভাযাত্রার সূচনা হয়। হাতে গেরুয়া পতাকা ও মুখে স্বামীজীর জয়ধ্বনি দিতে দিতে শতাধিক যুবক-যুবতীর এই শোভাযাত্রা আলমবাজার, দক্ষিণেশ্বর আর আদ্যাপীঠের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। প্রায় এক ঘণ্টা পরিক্রমার পর দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে অবস্থিত সেবাভারতীর কার্যালয়ে এই শোভাযাত্রার সমাপ্তি ঘটে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগর কার্যবাহ জয়ন্ত পাল।

এস্‌পিকের অনুষ্ঠান

শ্যামাপ্রসাদ ইনস্‌টিটিউট অব্‌ কালচার (এস্‌পিক) আয়োজিত বর্ষব্যাপী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তীর প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান গত ১২ থেকে ১৫ জানুয়ারি বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে পালিত হয়েছে। স্বামীজীর অসংখ্য কাট-আউট, বাণী ও জীবন্ত ট্যাবলোসহ বাদ্যযন্ত্র সমন্বয়ে বর্ণাঢ্য বিশাল শোভাযাত্রা হাওড়া জেলার তাজপুর ও কুশবেড়িয়া গ্রামপঞ্চায়েতের প্রায় ৭ কিমি. পথ পরিক্রমা শেষে এস্‌পিক-এর প্রসাদতীর্থ সভাগৃহে মিলিত হয়ে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও আরতির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী ভাষণে আশীর্বাণী উচ্চারণ করেন নরেন্দ্রপুর লোকশিক্ষা পরিষদের পূজনীয় স্বামী পরমানন্দ মহারাজ। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বহু দুর্লভ ছবির মাধ্যমে সাজানো চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রাহালয়ের উপ- অধিকর্তা অমল রায়। যুবদিবসের তাৎপর্য বিষয়ে মনোগ্রাহী বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট বিবেকানন্দ গবেষক অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বর্ষব্যাপী বৃক্ষরোপণের

সূচনা করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক অসিত মিত্র ও সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা উদ্‌যাপন কমিটির সভাপতি পৃথ্বীশকুমার সামন্ত। এছাড়াও দুইদিন বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যথা— বিবেকানন্দের রচনা থেকে পাঠ, কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, বসে আঁকো, হস্তলেখা, সঙ্গীত, কুইজ আয়োজিত হয়। প্রতিদিনের সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত শিল্পী সমন্বয়ে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, ভক্তিগীতি, যন্ত্রসঙ্গীত ও আলোক প্রক্ষেপণের মাধ্যমে বিবেকানন্দের জীবনালেখ্য প্রদর্শন করা হয়।

১৫ জানুয়ারি প্রসাদস্মৃতি ফুটবল প্রতিযোগিতার ২৩তম বর্ষের চূড়ান্ত খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলার মাঠে বিশেষ আকর্ষণ ছিল ছোট ছেলেমেয়েদের 'বিবেকানন্দ সাজো' প্রতিযোগিতা।

সাইকেল শোভাযাত্রা

গত ১৫ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের ১৫০তম জন্ম তিথি উপলক্ষে দক্ষিণ চব্বিশপরগণার সুন্দরবনের জেলার রায়দিঘী খণ্ডের স্বয়ংসেবকরা, প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুলকৃষ্ণ বিশ্বাসের নেতৃত্বে সাইকেলে সুন্দরবন জেলা পরিভ্রমণে করেন। ৩০ জন স্বয়ংসেবক স্বামীজীর ছবি ও বাণী সম্বলিত প্ল্যাকার্ড নিয়ে প্রায় ৯০ কিমি. পথ পরিভ্রমণ করে। যাত্রা শুরু হয় সকাল ৭ টায় কাশীনগর শাখা থেকে। এরপর সেই শোভাযাত্রা কৃষ্ণচন্দ্রপুর, রানাঘাট হয়ে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ মিশনে পৌঁছায়। ওখান থেকে জালাবেড়িয়া আশ্রম ও হিন্দু বিদ্যালয়। তারপর জামতলা হয়ে কৈখালী রামকৃষ্ণ আশ্রম। ওখান থেকে খেয়াপার হয়ে কাঁটামারী হয়ে দক্ষিণ দুর্গাপুরে মকরসংক্রান্তি উৎসব পালন করে। তারপর মধ্যগুড়গুড়িয়া হয়ে ঢাকী। ওখান থেকে খেয়াপার হয়ে জ্যোটা। তারপর জ্যোঠার দেউল (প্রাচীনতম মন্দির) হয়ে, রায়দিঘী হয়ে উক্ত শোভাযাত্রা সন্ধ্যায় কাশীনগর শাখাতে শেষ হয়।

নদীয়ায় সঙ্ঘের শীত শিবির

স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষ জন্ম দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নদীয়া জেলার পক্ষ থেকে আয়োজিত দু'দিন ব্যাপী বিবেকানন্দ শীত শিবির ২৩ জানুয়ারি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর শুভ জন্মদিনে সমাপ্ত হলো। ২২ জানুয়ারি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়ে এই শিবিরের হয় শুভ সূচনা কৃষ্ণনগর এ ভি স্কুলের সম্মেলন কক্ষে। পরদিন, অর্থাৎ ২৩ জানুয়ারি ২৪৬ জন পূর্ণ গণবেশধারী স্বয়ংসেবকদের এক বর্ণাঢ্য পথসঞ্চলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৬ কিমি পথ। শোভাযাত্রাকে আকর্ষণীয় করে তোলে ঘোষ (বাদ্যযন্ত্র) ও সুসজ্জিত ট্যাবলো। রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে নাগরিকবৃন্দ বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে পথসঞ্চলন প্রত্যক্ষ করেন। বাড়ি ছাদ থেকে কোথাও কোথাও পুষ্পবৃষ্টিও করা হয়।

২৩ জানুয়ারি বিকেলে হয় সমারোপ অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয় বিভিন্ন ব্যায়াম যোগ ও লাঠিখেলা। সমারোপ ভাষণ দেন পূর্বক্ষেত্রের কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার।

সঙ্গীতচর্চা কেন্দ্রের অনুষ্ঠান

উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সংস্কার ভারতীর সঙ্গীত ও নৃত্য বিভাগের প্রমুখ জয়া চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে সঙ্গীতচর্চা কেন্দ্রের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্প্রতি গাজোল অন্নদাশংকর সদনে অনুষ্ঠিত হলো। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন গাজোলের বি.ডি.ও আজমল হোসেন। অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর পরেশ চন্দ্র সরকার, অনুপ দাস, সাংবাদিক রথীন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে শ্রীমতী জয়া চক্রবর্তীর এবছরের গানের অ্যালবাম 'গানে গানে ভাঙল ঘুম'-এর আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়। উল্লেখ্য ইতিপূর্বে ২০১১ সালে বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ-এর মাধ্যমে দুই দিনাজপুর-মালদা জেলার সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জয়া চক্রবর্তীকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছিল রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নৃত্য, নজরুল সঙ্গীত ও নৃত্য, ছিল তবলা লহরা। এছাড়াও বিশেষ আকর্ষণ ছিল ভারতনাট্যম নৃত্য প্রদর্শন। কক্ষের বাইরে ছিল সুন্দর চিত্রপ্রদর্শনী। অবশেষে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয়।

শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের সম্মেলন

বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের সপ্তম দ্বি-বার্ষিক মালদা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ললিত মোহন শ্যামমোহিনী উচ্চ বিদ্যালয়ে গত ১৫ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তির দিনে। মালদা জেলার বিভিন্ন প্রান্তের বিদ্যালয়গুলি থেকে ৭০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের সংগঠন সম্পাদক মহেন্দ্র কাপুর। ডঃ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ তুষারকান্তি ঘোষ, প্রাক্তন প্রবীণ শিক্ষক অহিভূষণ সরকার অনুষ্ঠানে শিক্ষকদের সামনে বক্তব্য রাখেন। সভাপতির ভাষণে ডঃ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষায় সমাজমুখী প্রবণতা ব্যাহত হয়েছে বলে দুঃখ প্রকাশ করেন। শিশুদের শিক্ষার অধিকার ও মূল্যবোধের ওপরেও তিনি জোর দেন। ডঃ তুষারকান্তি ঘোষ বলেন, এখন ৩৭ শতাংশ শিক্ষার বাইরে রয়েছে। ড্রপ আউটের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। শিক্ষকদের স্থবির হয়ে গেলে চলবে না। তাদের ছাত্রদের যথাযথ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ও সুনাগরিক তৈরিতে বড় ভূমিকা নিতে হবে। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কুশিদা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সত্যনারায়ণ মজুমদার। তিনি তার ভাষণে ভারতীয় সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার তৈরির কুফল বর্ণনা করেন এবং চরিত্র গঠনের শিক্ষার ওপর জোর দেন। আরেক প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক (ললিত মোহন উচ্চ বিদ্যালয়) অহিভূষণ সরকার, শিক্ষকদের চাকুরীজীবী নয় মানুষ গড়ার কারিগর হিসাবে শিক্ষাদান করার কথা বলেন। প্রধান অতিথি মহেন্দ্র কাপুর, স্বামীজী, অরবিন্দ ও প্রণবানন্দের বিচারধারা যাতে সমাজে পৌঁছায় তার জন্য এবং শিক্ষায় ভারতীয়করণের উপর শিক্ষকদের কাজ করার আহ্বান জানান। নিজস্ব শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে ছাত্রদের তৈরি করতে হবে বলে মন্তব্য করেন। শেষে জেলার নতুন কমিটি গঠন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র পাল জেলা সম্মেলনে সব সময় উপস্থিত থেকে কমিটি গঠনে সহায়তা করেন।

'শ্রদ্ধা'র সম্মেলন

শ্রদ্ধা সংস্থার ২য় বার্ষিক সম্মেলন সিউড়ী শুক্লাভবনে অনুষ্ঠিত হয় গত ৮ জানুয়ারি। এই অনুষ্ঠানে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন দৈনিক চন্দ্রভাগা পত্রিকার সম্পাদক কিশোরী রঞ্জন দাশ। সকাল ১০টায় শঙ্খ ও ওঁকার ধ্বনি দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন শ্রদ্ধার সভাপতি নিরঞ্জন হালদার ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন দীনেশ মিশ্র। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'শ্রদ্ধা'র উপযোগিতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। শ্রদ্ধার সম্পাদক লক্ষ্মণবিষ্ণু ওই বৎসরে বারোজন সহস্রচন্দ্র দর্শনকারী বা শ্রদ্ধেয় মানুষকে শ্রদ্ধার পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়েছে বলে জানান।

আন্দামান নিকোবর দ্বীপ সমূহে মকর সংক্রান্তি ও পোঙ্গল মহোৎসব

প্রতি বছরের মতো ও বছরও ১৫ জানুয়ারি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং ধর্ম যাত্রা মহাসঙ্ঘ পোর্টব্লেয়ার-এর নিকট কাবেরী কুঞ্জ (কারবাইন্স বীচ) এবং মধ্য আন্দামানের রঙ্গত-এ অবস্থিত আমকুঞ্জ শ্রীশ্রী শিব গঙ্গা মন্দিরে যজ্ঞ, ভজন, গঙ্গা স্নান, গঙ্গা পূজন, প্রবচন ইত্যাদির মাধ্যমে মহা ধুমধামের মাধ্যমে মকর সংক্রান্তি ও পোঙ্গলমহোৎসব পালন করা হয়। চিন্ময় মিশনের স্বামী শুদ্ধানন্দ সরস্বতীজী, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী হরিপদানন্দ মহারাজ, সাধু পাহাড়ের স্বামী সূর্যনাথজী, অদ্বৈত আশ্রমের স্বামী ব্রহ্মানন্দগিরি, ইস্কনের স্বামীজী এবং পরিষদের কার্যকর্তাগণ মার্গদর্শন করেন।

কার্যক্রমের শেষে সকল ভক্তজনদের খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, ধর্মযাত্রা মহাসঙ্ঘ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, সেবা ভারতীসহ বিবিধ সংগঠনের পদাধিকারীগণ উপস্থিত ছিলেন। মঞ্চের সঞ্চালন করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রান্ত সম্পাদক শম্ভুনাথ বিশ্বাস।

শোক-সংবাদ

পরলোকে সুনীল দাস

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ স্বয়ংসেবক ও প্রাক্তন প্রচারক সুনীল দাস গত ১৪ জানুয়ারি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫১ বৎসর। বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার ধরমপুর গ্রামে তাঁর বাড়ী ও সেই গ্রামের শাখারই স্বয়ংসেবক। ১৯৮৪ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত তিনি সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে নানা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন। ছয় ভাইয়ের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ।

***

রিষড়া নগর বৌদ্ধিক প্রমুখ শ্রী লালজী বর্মার মাতৃদেবী ধনরাজীদেবী গত ১৮ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি তিন পুত্র, এক কন্যা ও আত্মীয়-পরিজনদের রেখে গেছেন।

***

কলকাতা পশ্চিমভাগ সম্পর্ক প্রমুখ শ্রী সর্বেশ রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পবন কুমার রায় গত ৮ জানুয়ারি মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে ঝাড়খণ্ডের কয়লা খনিতে অগ্নিকাণ্ডে মারা যান। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারের সকল আত্মীয়-পরিজন ও সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা শোকাহত।

সংস্কার ভারতীর নিজস্ব কার্যালয় উদ্বোধন

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় সনাতন জীবনমূল্যের ভিত্তিতে সক্রিয় কলাকুশলীদের সর্বভারতীয় সংগঠন সংস্কার ভারতী'র পশ্চিমবঙ্গ শাখার নিজস্ব কার্যালয়ের মহাসমারোহে উদ্‌ঘাটন হয়ে গেল গত ২৬ জানুয়ারি সকালে। মানিকতলায় বলদেওপাড়া রোডে ওইদিন সকাল থেকেই পুজো ও হোমযজ্ঞের আয়োজন ছিল। ঠিক সকাল দশটায় প্রদীপ জ্বালিয়ে সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন সংস্কার ভারতীর পশ্চিমবঙ্গের উপদেষ্টা কেশব দীক্ষিত এবং পূর্বক্ষেত্রের সভাপতি ও বিশিষ্ট অভিনেতা ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে একে একে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী মণ্ডলের সদস্য শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ, সংস্কার ভারতী'র সর্বভারতীয় যুগ্ম সংগঠন সম্পাদক আমীরচাঁদজী, অরুণ চক্রবর্তী (প্রথম রাজ্য সম্পাদক), কেশবরাও দীক্ষিত এবং সবশেষে ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণজী কার্যালয়কে কেন্দ্র করে কাজের পরিধি বিস্তৃত করার কথা বলেন। আমীরচাঁদজী সাংগঠনিক ভিত্তি সুদৃঢ় করার বিষয়ে জোর দেন। কেশবজী তাঁর ভাষণে বলেন, সংস্কার ভারতীর এক বৃহত্তর আদর্শগত ভূমিকা রয়েছে। আমেরিকা তথা পাশ্চাত্যে যখন সমাজ-পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে যাচ্ছে; ভারতেও সেই পাশ্চাত্য জীবন পদ্ধতি অনুকরণ করার প্রয়াস দেখা যাচ্ছে সেক্ষেত্রে সমাজকে সুস্থিরভাবে ধরে রাখার দায়িত্ব সংস্কার ভারতীর। শুধুমাত্র সংগঠন নয়, জীবনমূল্য বোধের সংস্কার প্রদান করাও সংস্কার ভারতীর কাজের অন্তর্ভুক্ত।

ভিক্টর ব্যানার্জী আশা প্রকাশ করে বলেন, ভারতীয় বৈদান্তিক আদর্শই দিশাহীন মানবসমাজকে পথ দেখাবে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ক্ষেত্রীয় সম্পাদক সুভাষ ভট্টাচার্য। এছাড়া বিশিষ্ট শিল্পী রুমা মুখোপাধ্যায় ও তনুশ্রী মল্লিকের গান অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা প্রদান করে। সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত, সহক্ষেত্র প্রচারক অজিত মহাপাত্র, সংস্কার ভারতীর প্রবীণ কর্মকর্তা বিমল লাট, পূর্ণচন্দ্র পুইতুণ্ডি এবং আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।